Government of West Bengal

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

ধনধান্য

শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২০২৩

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ২০২৩

পড়ুয়া সপ্তাহ পালন ২০২৩

লাফ দড়ি খেলা প্রতিযোগিতা ২০২৩

আগমনী উৎসব ২০২২

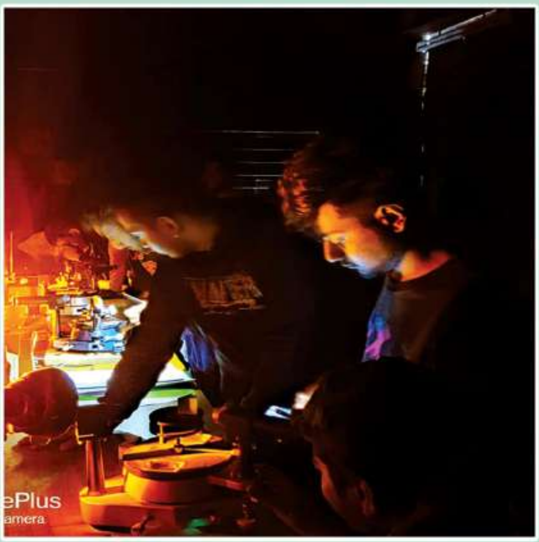

পদার্থবিদ্যা পরীক্ষাগার

কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন ২০২২

ধনধান্য

ষষ্ঠ সংকলন ২০২২-২০২৩

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদিয়া, পিন-৭৪১১৬০

ধনধান্য

ষষ্ঠ সংকলন ২০২২-২০২৩

প্রকাশক ও সত্ত্বাধিকারী ঃ
ড. শিবশংকর পাল, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

প্রকাশকাল ঃ
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

প্রচ্ছদ ঃ শুভদীপ দেবনাথ

নামাঙ্কন ঃ
ড. শিবশংকর পাল

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
বাচ্চু বিশ্বাস

সম্পাদক ঃ
গৌরাঙ্গ মণ্ডল, গ্রন্থাগারিক
গোপাল মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস বিভাগ)

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদিয়া, পিন-৭৪১১৬০

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা নং
১	ও মেয়ে	দিশা দেবনাথ	১
২	আজ আমি মেয়ে	অর্ণবী বিশ্বাস	১
৩	খামখেয়ালি	পার্থ শর্মা	২
৪	**A New Year**	Mouli Biswas	২
৫	সীমাহীন ভালোবাসার জগৎ 'বাবা'	রিম্পা দে	৩
৬	রাজকুমারী বর্ষা	জিসান সেখ	৪
৭	আলোকসজ্জা	নিশান মণ্ডল	৪
৮	মানুষ	রিনা বিশ্বাস	৫
৯	আমার কাছে বাবা মানে	প্রতিমা দাস	৫
১০	হেমাঙ্গ বিশ্বাস : এক ব্যতিক্রমী সঙ্গীতশিল্পী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী	ডঃ শিবশংকর পাল	৬
১১	পঞ্চাশের মন্বন্তর ও চার্চিলের ষড়যন্ত্র	দিশা গুঁই	৯
১২	বুদ্ধের জীবনী ও বাণী	রুবিনা খাতুন	১১
১৩	"দোস্তোজী" ও ভারতের মুক্তিসংগ্রাম	রঘুনাথ রায়	১২
১৪	পুরী ভ্রমণের স্মৃতি	রাকেশ ধর	১৬
১৫	ইতিহাসে নারীচরিত্রের অভিত্ব	মায়া বৈরাগ্য	১৭
১৬	ছিন্নমস্তা পূজা ও তার ইতিহাস	সৌম্যদ্বীপ হালদার	১৯
১৭	ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি নারী	রাকেশ ধর	২১
১৮	দার্জিলিং এর পাঁচটা দিন	সুনীতা মণ্ডল	২৪
১৯	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য : ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা	সুনীতা মণ্ডল	২৫
২০	সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুরহস্য	দিপাশ্রী বিশ্বাস	২৭
২১	ভূস্বর্গ	রুবেল সেখ	২৯
২২	স্মরণীয় বরণীয়	ডঃ শুভদীপ দেবনাথ	৩১

সম্পাদকীয়

শিক্ষাই শক্তি, জ্ঞানই আলো, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মায়ের কোল থেকে শিশুর যে শিক্ষার শুরু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় তার ব্যাপক ব্যাপ্তি ঘটে। মানব সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই মানুষ শিল্পকলাকে লালন, ধারণ ও চর্চা করে আসছে। প্রথাগত সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর নান্দনিক গুণাবলী ও শিল্পীসুলভ চিন্তাধারার প্রকাশ পায় একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকার মাধ্যমে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। আর এই মাতৃভাষাতেই আমাদের বার্ষিক আয়োজন 'ধনধান্য'। রাজ্যের প্রান্তিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও 'তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়' প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই সাংস্কৃতিক রুচি বোধের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে। ইতিমধ্যেই 'ধনধান্য' তার উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। এবারের প্রকাশনাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

'ধনধান্য' ষষ্ঠ সংকলনকে যাঁরা তাঁদের লেখা, হাতে আঁকা ছবি ও অন্যান্য সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয়ের সচেতন দিকনির্দেশনা, এছাড়াও সমস্ত সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক, সমস্ত প্রকাশনা উপ-পরিষদের সদস্যবৃন্দ যাঁদের মূল্যবান মতামত, সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় এই পত্রিকা পূর্ণতা পেয়েছে তাঁদেরকে সম্পাদকদ্বয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনিচ্ছাকৃত কোনোরূপ ভুল ত্রুটির জন্য সম্পাদকদ্বয়ের পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। 'ধনধান্য' আগামীদিনে আরও বেড়ে উঠুক, সার্বিক দিক থেকে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই কামনা। একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সম্পাদকীয় শেষ করছি।

গৌরাঙ্গ মণ্ডল
গোপাল মণ্ডল
(যুগ্ম-সম্পাদক)

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে

ড. শিবশংকর পাল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

মাধ্যমিক ইশকুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিদেন বছরে একটা করে পত্রিকা বের হয়। সাহিত্য পত্রিকা বলতে আমরা যা বুঝি এগুলি তার বাইরে নয়। তবে এগুলির নিজস্ব চরিত্র থাকে না। পাঁচমিশেলি রচনায় পাতা ভরানো হয়। প্রকাশিত হয় পড়ুয়াদের নানা স্বাদের, বিভিন্ন ঢঙের, বিচিত্র রঙের রচনা, ছবি ইত্যাদি। এর মধ্যে দিয়ে পড়ুয়াদের মনমর্জির কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এটা মস্ত একটা লাভ। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাঁদের অঙ্কুরগুলিকে চিনে নিতে পারেন। এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারেন। শিক্ষকরাও কেউ কেউ নিমরাজি হয়ে লেখেন। কেননা, কোনও মানদণ্ডেই এই পত্রিকাগুলোকে সাময়িক পত্র বলা যায় না। বিভিন্ন ভাষায় যে সকল পত্রপত্রিকা বেরয় সেগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার কথা যদি মাথায় রাখি, তাহলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষত কলেজের পত্রিকাগুলি এই পর্যায়ে পড়ে না। সাময়িক পত্রিকাগুলি সাহিত্যসংস্কৃতির মূলধারাকে বহন করে এটা যদি না-ও বলা যায়, সাহিত্যশিল্পের প্রধান পরীক্ষানিরীক্ষার ধারক ও বাহক যে এই সকল সাময়িকী— এ কথা বোধকরি সকলেই মানবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকাগুলির কথা আলাদা। সেখানে লেখেন মূলত শিক্ষকরাই, তাদের 'চাকরি'র উন্নতির ধাপ টপকানোর জন্যে। এসব লেখা মূলত বিদ্যায়তনিক ও নীরস। তত্ত্ব ব্যতিরেকে সৃজনের কোনও চরিত্রই তেমন থাকে না। এবং পত্রিকাগুলির স্বীকৃতিসূচক একটা বিশেষ সংখ্যাগত কৌলিন্য থাকে বলে শিক্ষকদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কলেজের বাৎসরিক পত্রিকাগুলিতে লেখার ব্যাপারে তাঁদের কোনও আগ্রহ থাকে না। কারণটা সকলেই বোঝেন। অনেকে আবার কলেজের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে মুখে কিছু না বললেও অন্তরে নাক সিঁটকোন। মনে করেন পয়সা খরচ করে কিছু জঞ্জাল জড়ো করা হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মনোভাবের ঘোর বিরুদ্ধে। কেন, তা বলা দরকার।

আজকের স্মার্টফোনের জমানায় ছাপার অক্ষরে হোক বা দেওয়ালে টাঙানো কিম্বা অন্তর্জালের বিভিন্ন মাধ্যমে যখন কোনও বিদ্যার্থীর রচনা বা নানা কিসিমের সৃষ্টি প্রকাশ হয়, তখন স্রষ্টার মনে প্রভূত আনন্দ হয়। এই আনন্দ একাধারে বিমল ও ভাগযোগ্য। তরুণমনের এই রসায়নকে উৎসাহ দেওয়া উচিত বলেই মনে করি। এই আনন্দের পিছনে রয়েছে আত্মপ্রকাশের ও প্রসারের নির্মল চাহিদা। প্রসারণকারী মন চায় একটা স্বীকৃতি, সহৃদয়হৃদয়সংবাদী গ্রাহক। তখন মান বা গুণগত বিচার গৌণ হয়ে যায়। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে আনন্দিত হন না এমন মানুষ পাষাণ। তাছাড়া আত্মপ্রকাশের মধ্যে জন্ম নেয় আত্মপ্রত্যয়। এটা খুব জরুরী ও দামী বস্তু। কেননা একজন পড়ুয়া বা বিদ্যার্থীর আত্মপ্রত্যয় গড়ে দেওয়াটাই একজন শিক্ষকের প্রধান কাজের মধ্যে পড়ে। তারপর আসে গুণমানে তাকে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার আর এক দায়িত্ব। পড়ুয়া প্রত্যয়ী হয়ে উঠতে পারলেই আত্মতার জাগরণ ঘটে। সেই আত্মতা তাকে জানান দেয়, আমিও পারি— লিখতে পারি, আঁকতে পারি, গাইতে পারি, নাচতে পারি ইত্যাদি। হয়ত মানের বিচারে তার পারাটা উতরোয়নি, কিন্তু প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে সৃজনের প্রত্যয় তাকে শক্তি দেয়। তার দুর্বল জায়গাটাকে মজবুত করে। এভাবেই তার মধ্যে জাগে অনুশীলনের স্পৃহা; নবতর সৃষ্টির প্রেরণা। প্রতিভা মানে তো নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ক্রমাগত যোগ্যতর করে তোলাই। এই দিক থেকে কাঁচা কাজেরও স্বীকৃতি ও প্রকাশের অধিকার আছে। এই অধিকার নামীদামী বা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলো কখনই দেবে না। তখন ইশকুল- কলেজের বাৎসরিক পত্রিকাগুলিই হয়ে ওঠে বিদ্যার্থীদের আত্মতা প্রকাশের একমাত্র ভরসাস্থল। এই ছাতাটা ওদের মাথার উপর থেকে সরিয়ে নেওয়াটা কি যুক্তিযুক্ত?

দ্বিতীয়ত, পড়ুয়ারা যা লেখে বা রচনা করে, তার মধ্যে একটা বার্তা থাকে, অন্তত একটা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠার তাগিদ থাকে। উপস্থাপন বা পরিবেশন কিম্বা ভাষাছাঁদ হয়ত নেহাৎ কাঁচা, হয়ত উপযুক্ততার কাছাকাছি পৌঁছতেই পারেনি, কিন্তু একটা চেষ্টা তো আছে। সেই চেষ্টাটাকে, যাকে আমরা আত্মতা বলেছি, যদি আমরা মূল্য দিই, গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তাহলে তরুণতর রচনাকারের মধ্যে সর্জন জনিত যে রসায়নটি কাজ করে তা আরও জোরদার হয়। যাকে আমরা বলি প্রাণনা সেটিও পরের লেখায় সঞ্চার হয়। তখন পরবর্তী সর্জনায় উন্নতির লক্ষণসমূহ দেখা দিতে পারে। বাড়ে উদ্দীপনাও। এভাবেই পড়ুয়াদের মধ্যে বৃদ্ধি পায় প্রকাশ করার সামর্থ্য। বিশেষত আজকের ট্যুইশননির্ভর পড়াশুনোর জন্যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বানিয়ে লেখার, কল্পনা করার, পড়াশুনো করে নিজের বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার বা লেখার অভ্যেস নেই। বাজার ফেরতা রেডিমেড নোট তাদের নিজস্ব ভাবনা, কল্পনাশক্তি ও ব্যক্ত করার ক্ষমতাকে ভোঁতা করে দিয়েছে। কলেজের পত্রিকা যদি তার আপনাত্মসূচক রচনা বা সৃষ্টিকে প্রকাশের সুযোগ করে দেয় তাহলে সেই পড়ুয়ার যে আনন্দ হয় তা অমূল্য, তার কাছেও, শিক্ষকের পক্ষেও। কেননা আখেরে লাভ হবে উভয়েরই। একদিকে ছাত্রের আত্তীকরণের ক্ষমতা বাড়বে, অন্যদিকে জটিলতর বিষয়ে পাঠদান করতে শিক্ষকেরও সুবিধে হবে। এই সমীকরণটা আমরা সহজে বুঝতে চাই না বলেই এ বিষয়ে অনীহা বাড়ে।

তৃতীয়ত, প্রশ্ন উঠতে পারে, বছরে একটি পত্রিকা কতজনের দায়িত্ব নেবে? বা কতটুকু সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম হবে একটি পত্রিকা? কাকে ছাঁটব, কাকে রাখব— এসব সমস্যা দেখা দিতে পারে; দেবেও। প্রশ্ন ও প্রসঙ্গটি সঙ্গত। কিন্তু বছরভর যদি আমরা সিলেবাসের ফাঁকফোকর দিয়ে জীবনযাপনের ভিন্নতর পাঠ দিতে থাকি, এবং যাপনকে সর্জনার মধ্যে দিয়ে কী করে প্রকাশযোগ্য করতে হয় শেখাতে থাকি, তাহলে বিষয়টি আর বাৎসরিক থাকে না, বা পত্রিকার পাদপূরণের বাধ্যতার দায়ও নিতে হয় না। তখন নির্বাচনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠকে আসন পেতে দিতে হয়। তখন অনির্বাচিতও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দৌড় শুরু করার পথনির্দেশ পায়। এই পথটাও আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত বলে মনে করি।

আমাদের কলেজের কাঁচা বয়স। এখনও এক দশক পূর্তি হয়নি। কিন্তু সূচনালগ্নের প্রথম শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলেজ নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছে "ধনধান্য" নামে একটি বাৎসরিক পত্রিকা। মাঝে করোনার কারণে একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। শিক্ষার্থী- শিক্ষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যা জ্ঞানার্জনের অন্যতম শর্ত ও সহায়ক উপচার সে-সব থেকে আমরা প্রায় দুটি বছর বঞ্চিত ছিলাম। করোনাপরের জীবন আবার স্বাভাবিক হচ্ছে। ফলে আমরা পূর্ব ঐতিহ্যে ফেরার সুযোগ পাচ্ছি। একে ঠিকঠাক কাজে লাগানোই এখন আমাদের প্রধান দায়িত্ব। সেই দায় মাথায় নিয়ে এ বছরও যে "ধনধান্য" প্রকাশ হচ্ছে তা আমাদের কাছে আনন্দের বৈকি! হয়ত গুণে ও মানে আকাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছতে পারব না আমরা। তাতে কি! আকাশ ছুঁতে চেয়েছিলাম— সে কথাটাও তো প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্তে থেকে যাবে। ছোটো বড়ো পুরনো সাম্প্রতিক— বহু কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা ঘেঁটে দেখার সুযোগ হয়েছে, তার মধ্যে হাজার লেখার ভিড়ে দু-একটি রত্নখচিত লেখাও তো চোখে পড়েছে। আবার বিপরীতও দেখেছি। পরবর্তীকালে কেউ ডাকসাইটে লেখক হয়েছেন, অথচ কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁর প্রকাশিত লেখাটি ছিল বেশ কাঁচা —এমন নজিরও রয়েছে। অতএব চরৈবেতি বলে সবাই মিলে মাঠে নেমে পড়াই সমীচীন বলে মনে করি। মহাকাল কাকে ফেলবে, কাকে তুলবে সে বিচার আমরা না-ই বা করলাম।

ও মেয়ে

দিশা দেবনাথ, ৫ম সেমিস্টার (বি.এ. জেনারেল)

মাঠের ধারে বসে আছি, হতাশ আমি হয়ে।
মেঘ দেখো আজ ডেকে আনলো, বৃষ্টিকে যে গিয়ে।।
দূর থেকে যে ভেসে আসে, মিষ্টি একটা সুর,
মিষ্টি হবে না সুরটি কেন, সে যে এক মেয়ের পায়ের নূপুর।।
যতই আমি উঠতে যাই, বৃষ্টি জোরে পড়ে,
ঘাসের উপর বৃষ্টি ঝরে, টাপুর টুপুর করে।।
বৃষ্টি ভেজা ঘাসের উপর, মেয়েটি হেলে দুলে চলে,
ব্যথা পাবে ঘাসেরা কিরে, তারা আনন্দতে টলে।।
আলতা পরা রাঙা পা তার, দেখতে ভারী মিষ্টি,
শ্যামবর্ণা মুখটি যেন, সৌন্দর্য্যের বৃষ্টি।।
পরনে তার লাল শাড়ি, লম্বা ঘন চুল,
এটা কি এক সত্য দৃশ্য, নাকি আমার চোখের ভুল।।
আলতো করে বৃষ্টি পড়ে, তার গায়ের উপরে,
মুখটি যেন লক্ষ্মী প্রতিমা, হাসি ঝরে পড়ে।।
ও মেয়ে তুমি কে গো, এই দিকেতে এসো,
কিছু কথা বলবো তোমায়, চুপটি করে বসো।।
বসবো আমি এখন কি গো, যেতে হবে আমায়,
মায়ের যে কড়া হুকুম, নষ্ট করি না সময়।।
শুনে যারে ও মেয়ে, বাসা তোর কোথায়?
কে তোর মা-বাবা, বলে যা আমায়।।
বাবা আমার মহাদেব, কৈলাসেতে বাসা,
মা আমার গৌরী, তাঁর হুকুম যে ভালোবাসা।।
কি বলিস ও মেয়ে তুই, দেবকন্যা নাকি,
নাগো মশাই আমি ওই, মন্দিরেতে থাকি।।

আজ আমি মেয়ে

অর্ণবী বিশ্বাস, ৫ম সেমিস্টার **(বাংলা)**

যারে বল অলক্ষ্মী
তারে ছাড়া তোমার ঘরও তো অসম্পূর্ণ
যারে বল অশুচ
তারে ছাড়া তোমার পেটের ভাতও জোটে না
যারে বল অকম্মা
তারে ছাড়া তো তোমার যৌন কর্মটুকুও সম্পন্ন হয়না।
যারে বল মা
সেও তো মেয়ে
যারে বল, বোন, দিদি
সেও তো মেয়ে
তবে কীসের এত দূরে সরানোর ঝোঁক ?
কীসের এত অবহেলা
অপরাধ কী একটাই!
আজ আমি মেয়ে তাই ?

খামখেয়ালি

পার্থ শর্মা, ১ম সেমিস্টার (ইতিহাস)

খামখেয়ালি উদার মনে দিছে কভু ডাক।
মনের ভিতর খামখেয়ালির নিচ্ছে নদীর বাঁক।।
একাকিত্ব তিলে তিলে করছে তাকে গ্রাস।
জীবন তার চলছিল ভালো কিন্তু ডাকছে সর্বনাশ।।
জীবন নিয়ে স্বপ্ন দেখছে খামখেয়ালি-এ মন।
অচেতনা, অভাবনা গুনছে যে দিনক্ষণ।।
মন আমার, মন তাহার, খামখেয়ালি মন-এ বিদ্যমান।
উৎসব, আনন্দে আমরা করি খামখেয়ালির গান।।
রাগ, অভিমান, হিংসা সবই আগমিত খামখেয়ালির কারণে।
প্রশমিত হয় সবই অভ্যন্তরীণ জাগরণে।।
তাই তো বলি উদার মনে খামখেয়ালি হয় না কভু নিঃশেষ।
খামখেয়ালি দিচ্ছে ডাক! এর নেই তো কোনো শেষ।।

A New Year

Mouli Biswas, 5th Semester **(English)**

Here, comes a brand New year,
we wish the best of new things to explore,
New things to make, New things to establishe.
New year gifts a lots of lightenment
And a bunch of happiness,

New year makes every people's
life full of glorious,

New year brings to our life
A lots of love and blessings,

A New year, that God gifted,
Gives an enlightenment to our lives.

To Everyone, we wish that the best of things
Many wishen a new year brings to us.

সীমাহীন ভালোবাসার জগৎ 'বাবা'

রিম্পা দে, ৩য় সেমিস্টার (ইতিহাস)

তোমার আঙুল ধরেই হাঁটতে শেখা, হোঁচট খাওয়াও আছে,
মুখ থুবড়ে পড়েছি যখন তোমায় পেয়েছি আমি কাছে।
হঠাৎ ভীষণ কান্নাতে মুখ গুঁজে দিই কোলে,
কিন্তু তোমাদের তো কাঁদতে নেই, হয়তো বাবা বলে।
যন্ত্রমানব তুমি অনুভূতিগুলো যার প্রকাশে মানা —
দুই অক্ষরে সীমাবদ্ধ সীমাহীন ভালোবাসার জগৎ তুমি বাবা;
অকিঞ্চিৎ, অবান্তর আবদারের তুমিই ঠিকানা।
ঘামে ভেজা শরীরে রক্ত জল হয় সারাদিন,
কোনো জন্মেই শোধ হবে না বাবা তোমার এই ঋণ।
দিনগুলোতে লাগলো ডানা, হঠাৎ হলাম বড়ো আজ আমি,
কলেজের দোরগোড়াতে, পাশে ছিলে তুমি।
বাবা তুমি মনের জোর,
তুমিই যুদ্ধের ধর্ম—
পুরোনো জামায় নতুনের মনোভাব সকল বাবার ধর্ম।
বাবা মানে, হাজারটা সমস্যার সমাধান এক নিমেষে।
বাবা মানে, প্রথম শিক্ষার আলয় নিরাপদ আশ্রয়,
বাবা মানে, সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পরেও —
বাড়ি ফেরা একমুখ হেসে।
বাবা তুমি গল্পের মহানায়ক—
তোমাকে জানায় শ্রদ্ধা,
সকল বাবার অপর নাম তাই—
অলিখিত যোদ্ধা।
বাবা তুমি ধরে আছো হাত তাই
স্বপ্ন দেখি বড়ো হবার,
পৃথিবীতে সবসময় ভালো থাকুক
এই 'বাবা' নামক মানুষগুলো।

রাজকুমারী বর্ষা

জিসান সেখ, ১ম সেমিস্টার (বিজ্ঞান বিভাগ)

প্রখর গ্রীষ্মের সময় যখন
ক্লান্তিময় হয়ে ওঠে শরীর,
মনটা আকুল হয়ে যেন ডাকে
ওগো রাজকুমারী বর্ষা তুমি এসো।

সূর্যের প্রখর তাপে যখন মাটিতে ফাটল ধরে
গাছের সতেজ পাতাগুলি নিস্তেজ হয়ে নুয়ে পড়ে,
তখন প্রতিটি পাতা ডেকে বলে
ওগো রাজকুমারী বর্ষা তুমি এসো।

মাঠ, ঘাট, নদী, নালা যখন শুকিয়ে যায়,
পাখিরাও ডানা ঝাপটায় আকাশের দিকে,
চেয়ে থেকে আহ্বান জানাই
ওগো রাজকুমারী বর্ষা তুমি এসো।

উদাস মন নিয়ে যখন নদীর চড়ে বসে রাজকুমার
তপ্ত বালিয়াড়ি পারে না সান্ত্বনা জোগাতে
তখন, দূর আকাশের দিকে চেয়ে যেন ডাকে
ওগো রাজকুমারী বর্ষা তুমি এসো।

আলোকসজ্জা

নিশান মণ্ডল, ৩য় সেমিস্টার (ইংরেজি)

স্নিগ্ধ নিশীথ আলোকসজ্জা,
মৃদুজ্যোতি তব শীতলতাপূর্ণ।
আঁখি আছে যার, সে অস্থিমজ্জা
দর্শনে হয় কঠিনও চূর্ণ।।
স্বর্ণালী সেই মৃদুজ্জল আভায়
মন আঁকে দুটি নিরীহ আঁখি।
কে জানে এমনই এক নিশায়
ডেকেছিল প্রিয়ের কণ্ঠবাঁশি।।
স্বপ্ন ছিল এক সন্ধ্যায়, আজ সে স্মৃতি
ইশাদী ছিল একজন গগনেবহতি।
বিঘ্নিত করেনি তারে মেঘের গতি
ছড়িয়েছিল আজও ছড়ায় তার স্বর্ণজ্যোতি
কৃষ্ণে বিধু কলঙ্কে অহংকারী, জ্যোতির্ময় ঢেকেছে আলোকবর্ষ
পূর্ণ দৃষ্টি গ্রাস করবে নিদ্রাবেশিনী, তাই এত তার দর্প।

মানুষ

রিনা বিশ্বাস, ১ম সেমিস্টার **(দর্শন)**

বাক্য সত্য নিষ্ঠা ভক্তি সুচরিত্রবান,
আচার বিচার জ্ঞান গরিমা পবিত্র মনপ্রাণ।
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণাম পিতামাতা গুরুর চরণ,
শুদ্ধ হৃদয় শান্ত চিত্ত সম্যক আচরণ।
পরহিতে আত্মত্যাগ ভোগ শূন্য মন,
সুশিক্ষা দীক্ষা। আত্মভোলা মনুষ্য লক্ষণ।

কালচক্রে মানুষকুলের অতি ক্ষুদ্র মন,
বিনা স্বার্থে যায় না দেখা পর আপনজন।
কালো নয় আলোর জ্যোতি হয় উদ্‌গিরণ,
দেশপ্রীতি থাকে স্মৃতি জন্মদিন হয় উদ্‌যাপন।
কুপথে মন চলে সর্বক্ষণ, সুপথে দেয় বাধা,
ময়লা মাটি বোঝায় সবে অন্তর নয় সাদা।

কালে কালে সোনার মানুষ করে বিচরণ,
আপন কর্মে ঐক্যের বন্ধনে হবে পরিবর্তন।
খুলে যাবে জ্ঞান চক্ষু দেখবে আপন চেহারা,
নিরাশার কুলে বসে নিরালে হয়ে আত্মহারা।
আপন মনে ভাবতে ভাবতে জীবন হবে সার,
নিজের ভুল বুঝবে শেষে সব অন্ধকার।

আমার কাছে বাবা মানে

প্রতিমা দাস, ১ম সেমিস্টার **(ইতিহাস)**

আমার কাছে,
বাবা মানে সব আবদার
বাবা মানে সব কিছু।
বাবা মানে একটু হাসি
আর একটু খুনসুটি।
বাবা মানে আমার কাছে,
হাজার খুশির ঝলকানী,
বাবা মানে একটু ধমক
আর একটু ভালোবাসা।
বাবা মানে একটু তর্ক-
আর একটু অভিমানী।
বাবা মানে তুমি আমায়,
ভুল বোঝনা কোনোদিনই।
বাবা মানে Best Friend
বাবা মানে আমার তুমি।
বাবা মানে আমি তোমায়
অনেকটা ভালোবাসি।
বাবা মানে আমি তোমার
ছোট্টো একটা রাজ কন্যা।
বাবা মানে তুমিই সব
বাবা মানে সবকিছু।।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস : এক ব্যতিক্রমী সঙ্গীতশিল্পী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

ডঃ শিবশংকর পাল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা)

আমাদের কলেজবেলায় দুই বিশ্বাসকে নিয়ে আমরা খুব মাতামাতি করতাম। আমরা মানে যাঁরা আর এক বিশ্বাস নিয়ে জীবনের খোলনলচে আমূল বদলে দেওয়ার দীর্ঘ ও সংগ্রামী পথ চলায় বিশ্বাস করতাম। এই তিন বিশ্বাস নিয়ে আমাদের কলেজজীবন ভরভরন্ত থাকত। যখনকার কথা বলছি তখন একাদশ দ্বাদশ পড়ানো হতো কলেজে। এর ফলে আমাদের মাতামাতি চলত দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে। আমাদের প্রথম বিশ্বাস ছিলেন অবিসংবাদীভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গৎভাঙা শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস। আর দ্বিতীয় বিশ্বাস ছিলেন বরেণ্য গণসঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস। আশির দশকে শুরুর দিকে আমরা তখন অধিকাংশ কলেজপড়ুয়া আপ্রান্তিক সমাজ পাল্টানোর স্বপ্ন ও বিশ্বাসকে বুকে নিয়ে জীবনকে নবরূপ দেওয়ার স্বপ্ন দেখছি। ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান থেকে তখন আমরা কেবল দূরেই থাকতাম না, সংগত কারণেই মনে করতাম সত্যিকারের জীবন গড়ে তোলার প্রধান বাধা এইসব আপদ। মানুষের জীবন থেকে এই আপদবালাই দূর করতে হলে চাই জানকবুল লম্বা লড়াই। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রবল তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাটি মতান্তরে দিন বয়ে যেত আক্ষরিকভাবে। মনান্তরও ঘটত। বন্ধুত্বে দাঁড়িও পড়ে যেত কখনওসখনও। তবে আমাদের কাছে বন্ধুবিচ্ছেদের চেয়েও দামী ছিল সেই বিশ্বাস, যাকে আমরা আদর্শ বলি। কিন্তু আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি এই দুই বিশ্বাস আমাদের ভাঙা সম্পর্ক আবার জোড়াও লাগিয়ে দিতেন। দেবব্রত বিশ্বাসের কথা কমবেশি সকলেই জানি। তাঁর গান কাকে না মুগ্ধ করেছে। কেবল মুগ্ধতাই তাঁর গানের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, রবীন্দ্রগানের জগতে যে বিরাট বিপুল গভীর নির্জন আব্রহ্মাণ্ড অনুভূতির জগত রয়েছে তাকে তিনি শ্রোতার কাছ অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারতেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভরা রোমান্টিকভাকে তিনি গণসঙ্গীতের মুক্তি ও খোলা হাওয়া করে দিতে পারতেন। রবির গানকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যে লড়াই করেছিলেন প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতার বিপরীতে গিয়ে, তাই নিয়ে লিখেছিলেন 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত' বইটি। আমরা এই বইটিকে বেদ মনে করতাম। বইটি পড়ে আমরা তাঁকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতাম। প্রতিভার বিচারে হেমাঙ্গ বিশ্বাস একই উচ্চতার অধিকারী ছিলেন। সেই তুলনায় কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে আমরা খুব কম লোকই চিনি বা জানি। অথচ সুরে গানে কথায় মানুষকে উদ্দীপিত করতে তিনিও কম যেতেন না। আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা হয়ত তার নামটি পর্যন্ত শোনেনি। আজ আমরা খুব অল্প কথায় তাঁর জীবনের কিছু গল্প জেনে নেবো।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর, বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার মিরাশি গ্রামে। প্রয়াত হন ২২ নভেম্বর ১৯৮৭ সালে। হবিগঞ্জ হাইস্কুলে ইশকুলের পড়া শেষ করে শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজে ভর্তি হন। কলজে পড়তে পড়তেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি তৎকালীন কমিউনিস্ট ভাবধারার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন, সাল ১৯৩২ নাগাদ। একই সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার

বিরুদ্ধে ও শ্রমজীবী মানুষের হয়ে কাজ করতে করতে শারীরিকভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৩৫ সাল নাগাদ তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলবন্দী থাকার সময় তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় যাদবপুরের টিবি হাসপাতালে। চিকিৎসার কারণে তাকে কারাদণ্ড থেকে মুক্তিও দেওয়া হয়। শরীরও সেরে ওঠে অনেকটাই। সুস্থ হতে না হতেই তিনি আবার ১৯৪৮ সালে গড়ে ওঠা তেলেঙ্গনা কৃষি আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। ফলত আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। তিন বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন।

১৯৩৮-১৯৩৯ এই সময়কালে বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখদের সংস্পর্শে আসেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাম্যবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। এঁরা এবং আরও অনেকে মিলে এই সময় গড়ে তোলেন আই পি টি এ অর্থাৎ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। এবং পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত তিনি নিবিড়ভাবে এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৪২ সাল কংগ্রেসের নরম নিরাপদ নিরীহ নেতৃত্বে শেষ জবরদস্ত আন্দোলন - ভারত ছাড়ো শুরু হচ্ছে। ঐ সময় প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ বাংলা শাখার আমন্ত্রণে সঙ্গীত পরিবেশন করতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রথম কলকাতায় এলেন। এদিকে মূলত তাঁরই উদ্যোগে ১৯৪৩-এ সিলেটে গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠে। সহযোগিতা করেছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়াল। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে গণনাট্য সংঘের প্রধান সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার ছিলেন তিনিই। গান লেখা, সুরারোপ ও কণ্ঠদান তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতা ছিল অভ্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সেই সময় তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত গানগুলি হলো "তোমার কাস্তেটারে জোরে দিও শান", "কিষাণ ভাই তোর সোনার ধানে বর্গি নামে" প্রভৃতি। এই গানগুলি সমগ্র বাংলা অবিভক্ত অসম ত্রিপুরায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। অসমে তাঁর সহযোগী ছিলেন বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, 'এক যে ছিল গাছ' খ্যাত কবি অশোক বিজয় রাহা, সেতারশিল্পী কুমুদ গোস্বামী প্রমুখ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গীতজীবনে চিনবাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। চিনে তিনি গিয়েছিলেন চিকিৎসা করানোর জন্য, ১৯৫৬ সালে। আড়াই বছর চিনে থাকার সুবাদে তিনি দুটি কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথমত, খুব নিবিষ্টভাবে দেখেছিলেন মাও সে তুঙের নেতৃত্বে চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব। দ্বিতীয়ত, চিনের লোকসঙ্গীতের সুর রপ্ত করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। পরে তিনি বাংলার লোকসঙ্গীতে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলাগানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন। চিন ভারত মৈত্রী রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আজকের প্রজন্মের অনেকেরই হয়ত জানা নেই। এমনকি চিনা ভাষায় তিনি বেশ কিছু গানও লিখেছিলেন। ১৯৬১ সালে স্থায়ীভাবে চলে আসেন কলকাতায়। জীবন জীবিকার কারণে চাকরি নেন কলকাতায় অবস্থিত সোভিয়েত কনস্যুলেটের দ্বারা পরিচালিত সোভিয়েত দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে। তাঁর অনমনীয় আপসহীন মনোভাবের জন্য সোভিয়েত দেশ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে মতপার্থক্য ও দূরত্ব তৈরি হয়। এরই ফলস্বরূপ তিনি এই চাকরিটি ছেড়ে দেন। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও তাঁর স্নেহশীলতায় ঘাটতি ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্বের টানে বহু শিল্পী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭১-এ তার উদ্যোগে গড়ে ওঠে "মাস সিঙ্গার্স" নামে একটি গণসঙ্গীতের দল। এই দলটি নিয়ে জীবনের প্রান্তকাল পর্যন্ত তিনি গ্রামবাংলায় গান গেয়ে মানুষকে সমাজবদলের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বদলাতে চেয়েছেন সমাজমানসের স্বাদকোরক।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গীতচর্চায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত এবং এই দুয়ের মেলবন্ধনের সফল প্রয়াস। তাঁর সংগ্রহ করা লোকগীতির সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয়। অবিভক্ত ভারতের বহু রাজ্য জুড়ে তার গানের ভৌগোলিক পরিসর ব্যাপ্ত। এছাড়াও চিন, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত

বহু রাজ্যের সঙ্গীতের সুর ব্যবহার করে তিনি তাঁর গানে ও গায়নে প্রয়োগ করেছেন। বিশেষত রাশিয়ার লোকগানের সুর তিনি এমনভাবে স্বীকরণ করেছেন যে তাকে আর আলাদা করে চেনা আর সম্ভব নয়। পাশাপাশি বিস্ময়কর তাঁর সংগ্রহ। তাঁর গানের বাহিরানায় ঘরদোর দেশবিদেশ একাকার। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, নেপাল থেকে কালু সিং নামে এক সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, অপূর্ব কন্ঠসম্পদের অধিকারী ছিলেন তিনি। কালু সিং-এর কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নেপালি ঝাউরে সহ নেপালের নানা লোকগান। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গীতচর্চা কেবল সঙ্গীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নাটক ও নানা আঙ্গিকের নাট্যরূপে তিনি গানের প্রযোগ ঘটিয়েছিলেন। শোনা যায় উৎপল দত্তের বীর রসাত্মক নাটকে তিনি গান লিখে সরবরাহ করতেন। সুরও দিতেন। যার কোনও কোনও গানে সুরারোপে সহযোগিতা ছিল কালু সিং-এরও।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের দুটি প্রখ্যাত সংকলন হলো "হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান" ও "শঙ্খচিলের গান"। "শঙ্খচিলের গান" ছাড়াও বিখ্যাত ও একদা অতি জনপ্রিয় তাঁর কয়েকটি গান হলো, জন হেনরির গান "মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য",

"বাঁচব বাঁচব রে আমরা", "মশাল জ্বালো", "সেলাম চাচা, "আমি যে দেখেছি সেই দেশ" প্রভৃতি। বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় তাঁর একটি গ্রন্থও রয়েছে "লোকসঙ্গীত শিক্ষা"।

এই ছোট্ট আলোচনায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু এই রচনাটি লিখলাম তার কারণ আর কিছু নয়, আজকের দিশাহীন ঐতিহ্য ভুলে যাওয়া প্রজন্ম যদি এই মহান শিল্পী সম্পর্কে কিছুটা হলেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। যদি আমাদের মেধাচর্চায় তাঁকে আমরা জায়গা করে দিই, তাহলে আখেরে লাভ হবে আমাদের। মেধামননের ঘাটতি পড়তির দিনে এমন লড়াকু শিল্পীকে স্মরণ করলে আমাদেরই ঝোলাঝাম্পু ভরে উঠবে বৈকি। বিশেষত, যে নৈরাশ্যের কালো মেঘ আমাদের মাথার উপর ঘনিয়ে আসছে তাতে তারই একটি গান যেন আজও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। সেই কবে তিনি গেয়েছিলেন,

"আজাদী হয়নি আজও তোর,
নববন্ধনও শৃঙ্খলডোর
দুঃখরাত্রি হয়নি ভোর,
আগে কদম কদম চলো জোর,
শত শহীদের আত্মদান,
এ কি তারই প্রতিদান?
দেশদ্রোহীর এ বিধান
চূর্ণ কর কর অবসান।"

এই আলোচনায় একটি ব্যক্তিগত উপার্জনের কথা বলি। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ার সময় ঐ শহরে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল এই রচনাকারের। গান শোনা নয়, একটু কাছে যাওয়ার ও কথাবার্তা বলার সুযোগও হয়েছিল। এদিক থেকে এই লেখক নিজেকে খুব গর্বিত মনে করেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বলা সেই একটা কথা আজও শ্রবণে ও মর্মে গেঁথে রয়েছে এবং আজীবন থাকবে, সে যেন বা এক বীজমন্ত্র, 'পোলাপান হও আর লায়েক হও, একটা কথা শুইন্যা রাখো, সারাজীবন চোখকান খুলা রাইখ্যা পথ চলবা। তাইলে কেউ ঠকাইতে পারব না।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ও চার্চিলের ষড়যন্ত্র

দিশা গুঁই, ১ম সেমিস্টার **(ইতিহাস)**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সরকারের অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেপ্টেম্বর মাসে তা চরম আকার ধারণ করে। বাংলা সাল অনুযায়ী ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সংঘটিত হওয়ায় একে পঞ্চাশের মন্বন্তর বলা হয়। এ বছর তার আশি পূর্তি। এই মন্বন্তরের পশ্চাতে প্রকৃতসৃষ্ট কারণ নাকি মনুষ্যসৃষ্ট কারণ দায়ী এই আলোচনা প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেনের গবেষণা একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

দুই বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল থাবা ছিল সবচেয়ে করুণ। প্রায় ১ বছর ধরে দাপিয়ে এই মন্বন্তর বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে। বাংলার মানুষ অনাহারে অপুষ্টিতে, কোনো খাবার খেতে না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অনুমান করা হয় বাংলায় প্রায় ৪০ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৪৩ বঙ্গাব্দে এই মন্বন্তরের জন্য চার্চিলকে দায়ী করা হয়। এর প্রাথমিক কারণ হল চার্চিল এবং তার পরামর্শদাতারা ভারতকে জাপান ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। চার্চিলের মূলকথা ভারতে শুধু আধিপত্য বজায় রাখাই নয়, বানিজ্যিক অধিকারকে আরও শক্তিশালী করা। চার্চিল পুনরুদীয়মান জার্মানির বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জার ওপর গুরুত্ব করেছিলেন। নাৎসি বাহিনী পোল্যান্ডের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালালে ইংল্যান্ড জার্মানির বিরুদ্ধে ১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করল 'ভারতের ভাইসরয়ও ব্রিটিশের সাম্রাজ্যের ৪০ কোটি ভারতীয় প্রজার হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সমস্ত বিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার স্বার্থে উপনিবেশ ছিল অপরিহার্য।

তিন বছর ধরে ভাইসরয় লিনলিথগো ভারতের সামগ্রিক খাদ্যসংকট সম্পর্কে সতর্ক করে আসছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় গম সুলভ্য ছিল। কিন্তু নিত্য যাতায়াতে সক্ষম ভারতীয় জাহাজগুলি ব্যস্ত ছিল যুদ্ধোদ্যোগে। অর্থমন্ত্রী স্যার কিংগসলি উড অনেকদিন ধরে সতর্ক করে আসছিলেন যে যুদ্ধের পরবর্তীকালে দেখা দেবে, আমদানি খরচ বৃদ্ধি পাবে। গরিব মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল বিপর্যয়। ১৯৪২-এর আগস্টে ভারত সরকার সতর্ক করেছিল যে দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা ঘটতে পারে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের আগে বাংলায় ধানের উৎপাদন বিগত ১০ বছরের তুলনায় খুবই কম পরিমাণে হয়েছিল। যার ফলে ১৯৪০ সালের খাদ্যসংকট ১৯৪৩ সালে গিয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করে ও সংঘটিত হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে হওয়া ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস এর ফলে বাংলার আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে যে সমস্ত খাদ্যশস্য রক্ষা পেয়েছিল সেগুলোতেও বাদামি ছত্রাক ধরে নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে চালের পাইকারি দর ছিল মণ প্রতি ১৩ টাকা, ১৪ টাকা। ১৯৪৩ এর মার্চে তা দাঁড়ায় ২১ টাকা, মে মাসে ৩০ টাকা, আগস্ট মাসে ৩৭ টাকা এবং বেসরকারি মতে আরও বেশি। চট্টগ্রামে অক্টোবরে চালের দাম পৌঁছোয় ৮০ টাকা মণ। ঢাকায় ১০৫ টাকা।

কোনো ১ দিনে ভূমিকম্পের মতো দুর্ভিক্ষ বাংলার বুকে নেমে আসেনি। এ সবের পিছনে দায়ী মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হেতু বাংলায় বহু সংখ্যক সৈন্যের আগমন এবং যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্য নিযুক্ত কলকারখানায় বহিরাগত শ্রমিকদের জন্য সরকার বাজারদর অপেক্ষা বেশি দরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে নেয়। ফলে দেশের মোট খাদ্যশস্য থেকে একটা বড় পরিমান অংশ সৈন্যখাতে চলে যায়। আবার জাপানী আক্রমণে ভীত ব্রহ্মদেশবাসী লক্ষাধিক মানুষজন শরণার্থী হিসাবে বাংলায় প্রবেশ করে খাদ্যসংকট বাড়িয়ে তোলে। বিধান পরিষদে ফজলুল হক বলেছিলেন মার্চ মাসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ৪০০০০ শরণার্থী আশ্রয় নেয়। আবার খাদ্য আমদানির বদলে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। খাদ্যাভাবের অপর কারণ সরকারের 'Denial Policy' গ্রহণ। জাপানী সৈন্য বাংলায় প্রবেশ করে যাতে খাদ্য জোগাড় করতে না পারে তার জন্য চাষিদের ঘর থেকে খাদ্যশস্য সরিয়ে নেয় পরে যাতায়াতের পথ নষ্ট করে নৌকা বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় নৌকার অভাব অনুভূত হয়। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকার পোড়ামাটির নীতি গ্রহণের ভুল অনুধাবন করে। আবার গবাদি পশুর বহুদিন ধরে অভুক্ত থাকায় কর্মক্ষমতা হারায়। ফলে চাষের কাজ ব্যাহত হয়। আবার কোচিন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এবং শ্রীলঙ্কায় খাদ্য উৎপাদন কম হওয়ায়

সেখানকার ঘাটতি মেটাতে পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলের খাদ্য সেখানে পাঠানো হত। ফলে বাংলায় খাদ্য আমদানি কমে যায়। আবার বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হওয়ার কারণে সরকার খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ খাদ্য ক্রয় করতে না পেরে অভুক্ত হয়ে থাকেন। মানুষ খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী সন্তানকে হত্যা করতে বাধ্য হত। যার ফলে গ্রামের পর গ্রাম মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ দিয়েছিল। সরকার দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ১৯৪৩ সালে ঘটা পঞ্চাশের মন্বন্তর চিত্রটি খুবই দুঃখজনক একটি ঘটনা। এই পঞ্চাশের মন্বন্তরে অনাহারে ৪০ -৭০ লক্ষেরও বেশী মানুষ মারা যায়। রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ফতেমা বিবির স্বামী কালিকাকুন্তর অনতিদূরে নদীতে ফেরি নৌকো বাইত। ১৯৪২-এর সাইক্লোনের কিছু পরে বমি ও পায়খানা করে মারা যায়। সে তখন ষোল বছরের। তার কাছে একটা শিশু সন্তান ছিল, নাম সোপি। সোপির মা অনেক আগে মারা গিয়েছিল। ফতেমা বিবি তাকে কালিকাকুন্ডুর মুসলমান পল্লিতে নিয়ে আসে। দুর্ভিক্ষ তার বাবা মা ও দাদাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ফতেমা পড়ে রইল তার ছোট ভাই এবং সন্তানটিকে নিয়ে, যাদের লালন করতে হবে। বাষট্টি বছর পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কী ভাবে সে ও তার সন্তান বেঁচেছিল। তার সহজ-সরল উত্তর ছিল, "ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে ছিলাম। ছেলের জন্য ঝিগিরি করে এবং ভিক্ষে করে যতটা পারে খাবার জোগাড় করত। এর থেকেই বোঝা যায় যে মানুষ কতটা কষ্ট করে খাবার জোগাড় করত। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত মানুষ অখাদ্য পশুর মাংস, এমনকি কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে ডাস্টবিন থেকে খাবার নিয়ে খেত। সামান্য খাবারের জন্য ও তার পরিবারের সদস্যদের বাঁচানোর জন্য মানুষ যেকোনো কাজ করতে রাজি ছিল। কখনো আবার মানুষ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র খাবারের সন্ধানে যেতো। দুর্ভিক্ষের পর সরকার দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা নির্ধারণ কারর জন্য 'দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশন' গঠন করেছিল। যে কমিশন তার অনুসন্ধান চালানোর পর রিপোর্ট পেশ করছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর এর ফলে এই পঞ্চাশের মন্বন্তরকে উদ্দেশ্য করে একাধিক নাটক, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন-বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়ের "অশনি সংকেত" অমলেন্দু চক্রবর্তীর "আকালের সন্ধানে" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রন্থ এই পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছিল। অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন একটি কারণ হচ্ছে Exchange Entitlement যুদ্ধের কারণে কোন কিছু লোকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায়, আর কিছু লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি মানে বাকিদের কমে যাওয়া ১৯৪৩ এর একটা সময় জুড়ে চালের বাজার বলে কিছু ছিল না বাংলাদেশে। যেটা ছিল সেটা কোনো বাজার নয়, একটা rackateering–এর প্রক্রিয়া অমত্য সেন তাঁর Poverty and Famines, পল গ্রিনো তাঁর Prosperity and Misery in Modern Bengal - The Famine of 1943-1944 এবং মধুশ্রী মুখোপাধ্যায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র' বইতে পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্পর্কে লিখেছিলেন। সেই সময় সরকার ও কালোবাজারী মজুতদারেরা মিলে বাজার ধ্বংস করে দিয়েছিল। দর বৃদ্ধির প্রথম বলি গ্রামের কৃষকসহ সমাজের দরিদ্র মানুষ। কৃষক সমাজের দারিদ্র এবং মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ ছিল সমস্ত জমি-জমা মহাজন এবং জমিদারদের হাতে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিশেষ। ১৯৪২ সালে ভারতে মৃত্যুর হার ছিল ২.১। ১৯৩৮-এ জমি বিক্রি দেখা যায় প্রায় তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। পরের বছর, ১৯৩৯ অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর বছরে জমি বিক্রি আবার দ্বিগুন। কৃষিভিত্তিক সমাজে জমির মালিক খুবই বেকায়দায় না পড়লে জমি বিক্রি করে না। অর্থাৎ বাংলায় মন্দার এভাবে এই বিপর্যয়ের চূড়ান্তরূপ দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী।

ঐতিহাসিক পল গ্রিনো একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বাংলার সমৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা বাঙালির সনাতন মূল্যবোধের বিপর্যয়ই ছিল এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। যদিও এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুর্ভিক্ষ সংগঠনে সরকারের ভূমিকাকে আড়াল করা।

বুদ্ধের জীবনী ও বাণী

রুবিনা খাতুন, ১ম সেমিস্টার (ইতিহাস)

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকের মানুষ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে মা মায়াদেবীর কোল আলো করে ক্ষত্রিয় বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর জন্মের সাত দিন পর তাঁর মা মায়াদেবী মারা যান তখন তাঁর বিমাতা বা পালিত মা মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাকে লালন পালন করেন। সেইথেকে তাঁর নাম হয় গৌতম, গৌতমের আদি নাম সিদ্ধার্থ। গৌতম যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন মা মায়াদেবী যে শ্বেতহস্তি ও পদ্মফুলের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সর্বজনবিদিত, জ্যোতিষী বা গণ্যকাররা এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, তাঁর গর্ভজাত সন্তান ভবিষ্যতে একজন মহান শাসক অথবা মহান ধর্ম প্রচারক হয়ে উঠবেন। গৌতম অল্প বয়সে যশোধারা নামে এক মেয়েকে বিবাহ করেন। কিন্তু সাংসারিক বন্ধন তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। রাজপরিবার ও সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কাছে মনে হয়েছিল অসাড়। তাই তিনি এই মায়া ত্যাগ করে দুঃখের হাত থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজে পাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি রাস্তায় ৪টি দৃশ্য দেখতে পান; জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও আনন্দমণ্ডিত এক সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই তিনি মনে করেন এ জীবন অনেক সুখময়। তাই পুত্র রাহুল যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন গভীর রাতে তিনি গৃহত্যাগ করেন। সাত বছর ধরে তিনি নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান এবং ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধগয়ার নিকটস্থ উরুবিল্ব গ্রামে এক বৃহৎ পিপল গাছের তলায় বসেন। সেই সময় নিকটস্থ গৃহস্থ কন্যা সুজাতা তাঁকে একবাটি পায়েস দিয়ে যান এবং তিনি সেটা ভক্ষণ করেন। তাঁরপর, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যদি তাঁর দেহের রক্ত শুকিয়ে যায় এবং অস্থিগুলি অকেজো হয়ে পড়ে তাহলেও তিনি ধ্যান-ভঙ্গ হবেন না। এই স্থানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল নিরঞ্জ (ফাল্গু) নদী, ঊনপঞ্চাশ দিন তিনি এই বৃক্ষের তলায় একমনে ধ্যানাস্থানে বসে থাকেন। এরপর থেকে তিনি বুদ্ধ নামে পরিগণিত হন। তর্কযুদ্ধে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত সকলকে তিনি পরাজিত করতেন। গৌতম বুদ্ধ সহজ সরল ভাষায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। তিনি সকল মানুষকে দুঃখের হাত থেকে মুক্তির উপায় বলেছেন। তিনি সৎকর্ম, সৎকার্য, চিন্তা ভাবনা, সংকল্প ইত্যাদি পালনের নির্দেশ দেন। বুদ্ধ মনে করতেন "চরম ভোগবিলাস এবং চরম কৃচ্ছ্রসাধন দুই-ই আত্মার মুক্তির পথে অন্তরায় বা বাঁধা সৃষ্টি করে। এই কারণে দুই চরম পন্থার মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো জিনিস না রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৭ অব্দে ৮০ বছর (আশি) বয়সে কুশীনগর গ্রামে গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। অনেকের মতে, পাড়াতে তাঁর গৃহস্থ শিষ্য চুন্দর বাড়িতে শুকরের মাংস ভক্ষনই তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল। গৌতম বুদ্ধ যে ধর্মমত ও বাণী প্রচার করেন সেগুলি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট গুরত্ব আছে বলে আমি মনে করি। গৌতম বুদ্ধ তাঁর জীবনে নানা বাণী ও মত প্রকাশ করেছেন। মানুষের দুঃখ ও দুঃখ নিবারণের উপায় তিনি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষের অহংকার কোন দিন সত্যকে গ্রহণ করতে দেয়না তাই অহংকার করা কখনই উচিত নয়। অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু, এখনকার মানুষের ধন দৌলত, টাকা পয়সা, সৌন্দর্য নিয়ে অনেক অহংকার করে কিন্তু সেই অহংকার তাকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের কোনো পরিস্থিতি ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না একমাত্র পরিবর্তন হয় কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে সাহায্য করা। যদি আমরা অন্যর জীবনে আলোর প্রদীপ জ্বালাই তবে সেই আলোই আমাকে পথ দেখাবে। তাই সর্বদা সকল প্রকার মানুষকে সাহায্য করা দরকার। আমাদের জীবনের নৈতিক আচরণবিধি পালন করা অবশ্যই দরকার যথা - চুরি না করা, ব্যাভিচারী না হওয়া, হিংসা না করা এবং অন্যায় না করা। ভগবান বুদ্ধের দেওয়া বাণী অতুলনীয়, জীবনে চলার পথে একান্ত প্রয়োজন।

“দোস্তোজী” ও ভারতের মুক্তিসংগ্রাম

রঘুনাথ রায়, সহকারি অধ্যাপক **(ইতিহাস বিভাগ)**

‘দোস্তোজী’ কথাটি শুনলে প্রথমেই মনে পড়তে পারে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত নবীন পরিচালক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম চলচ্চিত্রের কথা। দেশ-বিদেশ খ্যাত “দোস্তোজী” চলচ্চিত্রটি আসলে নব্বইয়ের দশকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এক প্রত্যন্ত গ্রামের ভিন্নধর্মী দুই বালকের বন্ধুত্ব ও চূড়ান্ত বিচ্ছেদের গল্প। যে বন্ধুত্ব ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে জীবনের সুর, তাল, ছন্দ সব কিছুকে এক সুতোয় মিলিয়ে দেয়। বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে মুর্শিদাবাদের দুই বন্ধুর একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ-পলাশ ও আরেকজন মুসলমান পড়শি সফিকুল। দুই খুদে বন্ধুর মধ্যে আড়ি-ভাব, মান-অভিমান, খুনসুটি এবং নীরব ভালোবাসা সবই রয়েছে। বাবরি মসজিদ ধবংস ও মুম্বাই বিস্ফোরণের পরবর্তী সময়কালকে এই ছবির পটভূমি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবনাকে দেখানোই ছবিটির মুল উদ্দেশ্য বলে মনে করা যেতে পারে। তবে সম্প্রীতির ভাবনার পাশাপাশি ছোটবেলার সারল্য বন্ধুত্বের দিকটিও আসাধারণ। ‘দোস্তোজী’ প্রকৃতপক্ষে সিনেমার গল্প যা বাস্তবের মাটিতে সু-ফল প্রসব করবে এই আশা নিয়েই পরিচালক ছবিটি তৈরি করেছেন। যাইহোক এটি গেল সিনেমার কথা। আমি ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের পথে এইরকমই নির্ভেজাল দুইজন বিপ্লবীর বন্ধুত্বের কথা বলবো যা ইতিহাস হয়ে আছে তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিকতা পেতে পারে এই দুই ভিন্ন-ধর্মী মুক্তি সংগ্রামীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী।

বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভিন্ন ছিল স্বাধীনতার মুক্তি সংগ্রামীদের পথ ও মত। ভিন্নতা সত্ত্বেও ওই পথ এবং ধারাগুলির গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। এই বহুমুখী ধারার অন্যতম ধারা ছিল মুক্তিসংগ্রামীদের বৈপ্লবিক ধারা। ব্রিটিশ সরকার মুক্তিসংগ্রামীদের কার্যকলাপ নিয়েই সব থেকে বেশি ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত। তাই স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে শুধু জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন নয় সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামীদের আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সেনাবাহিনীর আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকের গণ-অভ্যুত্থান প্রত্যেকটি আন্দোলনের অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি আন্দোলনগুলি পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল মতাদর্শগত, ধর্মীয়, এবং বর্ণ ও জাতিগত বিভেদ। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, বিকাশ ও ভয়াবহ পরিনতিও ঘটেছিল। যার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষ প্রথমে দ্বিখন্ডিত (ধর্মীয় কারণে) হয়েছিল তারপর স্বাধীনতা লাভ করেছিল। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার চরমতম রূপও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছিল। তবে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার দিকটি দেখলে সত্যের অপলাপ করা হবে। সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও দৃষ্টান্ত রয়েছে যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিপ্রদান করেছিল। এই রকম দুজন সশস্ত্র সংগ্রামীদের কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এখানে তাঁদের সম্পর্ক বন্ধুত্বের সৌহার্দ্যপূর্ণতায় ‘দোস্তোজী’ হয়ে উঠেছিল। কোন সিনেমা বা গল্প নয় এটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে দেশপ্রেমের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মের ‘দোস্তোজী’র পরিচায়ক। যেখানে ভারত মাতৃকার চরণে আত্মবিসর্জনকারী দুই সম্প্রদায়ের মৈত্রীবন্ধনে স্বাধীনতার যাত্রাপথ মসৃণ হয়েছিল। এবারে দেখা যাক এই সশস্ত্র সংগ্রামীদ্বয় কারা? কি ছিল তাঁদের অবদান? সর্বোপরি কেন তাঁরা ‘দোস্তোজী’ হয়ে উঠেছে?

মুক্তিসংগ্রামী বৈপ্লবিক ধারার জনপ্রিয় দুইজন সশস্ত্র বিপ্লবী হলেন রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাকউল্লা খান। এবার আলোচনা করা যাক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের অবদান এবং সেই সূত্র ধরে তাঁদের বন্ধুত্বের কথা। যে বন্ধুত্ব দেশকে ভালোবাসা (দেশপ্রেম) এবং দেশের জন্য প্রান বিসর্জন দেওয়ার (শহীদ) পরিপ্রেক্ষিতে মজবুত হয়েছিল।

রামপ্রসাদ ও আসফাকউল্লা দুজনই জন্মগ্রহণ করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের শাহাজানপুর জেলায়। ১৮৯৭ সালের ১১ জুন পিতা মুরলীধর ও মাতা মুলমতি দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রামপ্রসাদ। তিনবছর পর ১৯০০ সালে ২২ অক্টোবর এক পাঠান পরিবারে আসফাকউল্লা জন্ম নেন। তাঁর পিতা ছিলেন শফিকউল্লা খান ও মাতা ছিলেন মাজহুর-উন-নিসা। রামপ্রসাদ বাবার কাছে হিন্দি শেখেন। বাল্যবয়সেই তিনি এক মৌলবির কাছে উর্দু শেখার সময় থেকেই উর্দু ভাষার প্রেমে পড়েন। বাবার অমতে ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হন। রামপ্রসাদ একই সাথে হিন্দি, ইংরাজী, উর্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তবে উর্দু শায়ের কবিতায় তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। এই উর্দু শায়ের কবিতার পারদর্শিতার কথা আসফাকউল্লা জানতে পারে নিজের বড়ো ভাই রিয়াসত উল্লাহের কাছ থেকে। আসলে রামপ্রসাদ বিসমিল ও রিয়াসতউল্লাহ দুজনেই ছিলেন সহপাঠী।

রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাকউল্লা খান-এর বন্ধুত্বের প্রাথমিক প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল উর্দু শায়ের কবিতার মাধ্যমে। যদিও রামপ্রসাদ ছিলেন সেই সময় 'শায়র' মহলে নামজাদা। রামপ্রসাদের উর্দু শায়ের শোনার জন্য আসফাকউল্লা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর আগ্রহ দেখাতেন। আসফাকউল্লা নিজে উর্দু শায়ের লিখলেও তিনি ছিলেন রামপ্রসাদের শায়ের-এর একাগ্র গুণমুগ্ধ পাঠক। এই উর্দু শায়ের কবিতা-ই ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে গড়ে তুলেছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দুজনেই কবিতা লেখার সময় ছদ্মনামে লিখতেন। রামপ্রসাদের ছদ্মনাম ছিল 'রাম', 'আগত', 'বিসমিল' ইত্যাদি। অপরদিকে আসফাকউল্লা 'ওয়ার্সি' এবং 'হজরত' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। এমন কথা শোনা যেত যে, আসফাক লিখতেন ও রামপ্রসাদ সেগুলি সংশোধন এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনও করে দিতেন। রামপ্রসাদ বিসমিলের রচনাগুলো সেই সময়ের সকল ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার মধ্যে অন্যতম হলো — 'দেশবাসীয়োকে নাম সন্দেশ', 'স্বদেশী রং', 'স্বাধীনতা কি দেবী'। এছাড়া তিনি 'বলশেভিক প্রোগ্রাম', 'এ স্যালি অফ দ্য মাইন, 'ক্যাথরিন' প্রভৃতি বেশ কিছু অনুবাদ সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর সব কবিতাতে বা রচনাতেই রয়েছে তীব্র দেশাত্মবোধ। তাঁর বিখ্যাত গান-

"সর ফরসি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হে,
দেখনা হে জোড় কিতনা বাজো এ কাতিল মে হে"

কথিত আছে এই গানের লাইনগুলো রামপ্রসাদ আর আসফাকউল্লা-র মিলিত প্রচেষ্টায় রচনা। এই গান মুক্তিসংগ্রামীদের দেশপ্রেমে জাগরিত করতো। বহু বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে এই গান গেয়ে মৃত্যুভয় জয় করেছিল। মাত্র আঠেরো বছর বয়সে ভাই পরমানন্দের ফাঁসির আদেশ রামপ্রসাদের মনে দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটায়। বাল্যকাল থেকেই রামপ্রসাদ বিসমিল আর্যসমাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। শাহাজানপুরে আর্যকুমার সভা স্থাপন করেন। আর্যসমাজ মন্দিরে স্বামী সোমদেবের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। লক্ষনৌতে কিছু বন্ধুর সহযোগে তিনি 'মাতৃভেদী' বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এরপর 'শিবাজী সমিতি' নামে একটি সশস্ত্র দলও গঠন করেন যা উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানের তরুন যুবকদের সংগঠিত করে। ১৯১৮ সালের ২৮ জানুয়ারি রামপ্রসাদ 'দেশবাসীয়োকে নাম সন্দেশ' নামে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। পরে তাঁর-ই রচিত কবিতা 'মেনপুরি কি প্রতিজ্ঞা'-র সঙ্গে ওই প্রচারপত্রটি বিতড়ন করা হয়। দলের তহবিলে টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁরা ডাকাতি এবং ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ বইপত্র বিক্রি করতে থাকে। তাঁদের এই কর্মকাণ্ড 'মেনপুরী ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত। কয়েকজন ধরা পড়লেও রামপ্রসাদ

পালাতে সক্ষম হন। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মেনপুরী ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। ১৯১৯ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত রামপ্রসাদ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে আত্মগোপন অবস্থায় বিভিন্ন বই প্রকাশ করতেন। পরবর্তীকালে যে বইগুলি "সুশীলমালা" নামক সিরিজে প্রকাশিত হয়। মেনপুরী ষড়যন্ত্র মামলার সমস্ত বন্দিরা মুক্তি পেলে রামপ্রসাদ নিজের জন্মস্থান শাহাজানপুরে ফিরে আসেন। রামপ্রসাদের শাহাজানপুর আসার খবর পাওয়ার পর থেকে আসফাকউল্লাহ উৎসাহী হয়ে পড়ে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য।

রামপ্রসাদ ও আসফাকউল্লা দুজনেই ভারতমাতার চরণতলে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেম তাঁদের বন্ধুত্বকে 'দোস্তোজী' হতে সহায়তা করেছিল। সেই সময় ভারতবর্ষে গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। তাঁরা দুজনেই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২২ সালে শাহাজানপুরে রামপ্রসাদ জনগণকে আন্দোলন সম্পর্কে জানানোর জন্য একটি সভা সংগঠিত করেন। ওই বছরই চৌরিচৌরা ঘটনার ফলে গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার ঘটনায় ক্ষুব্ধ রামপ্রসাদ জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করেন। আশফাকউল্লাও তাঁকে অনুসরন করেন। দুজনেই অহিংস আন্দোলনের আর্দশ পরিত্যাগ করে সহিংস লড়াইয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যান। এই মুক্তিসংগ্রামের পথ তাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল, যা আমৃত্যু অটুট ছিল।

রামপ্রসাদ, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা-সহ বেশ কয়েকজন তরুণের সহযোগে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য "হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন" (H.R.A) নামক বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রেও সংগঠনের প্রচার, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থের। তাই হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন-এর নয়জন সহযোগী ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট কাকোরি নামে এক গ্রামে আট নম্বর ডাউন শাহজাহানপুর-লখনউ ট্রেন আটকে রেলের সরকারি টাকা লুট করেন। এই অভিযানে বিখ্যাত জার্মান পিস্তল 'মাউজার আর সি ৯৬ (Mouser RC 96) ব্যবহার করা হয়েছিল। এই রেল ডাকাতিকে কেন্দ্র করে তাঁদের বিরুদ্ধে শুরু হয় কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের সাহস দেখে হতচকিত হয়েছিল। মামলাটি তদন্ত করবার জন্যে ভাইসরয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে নিয়োগ করেন। এক মাসের মধ্যে সি.আই.ডি সূত্র বের করে ফেলে এবং প্রায় সব বিপ্লবীদের একরাতেই গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সকালবেলা রামপ্রসাদ বিসমিল এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের পুলিস গ্রেপ্তার করে কিন্তু আসফাকউল্লাহ ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যার খোঁজ পুলিস পায় না। আসফাকউল্লা লুকিয়ে পড়েন এবং বারাণসী যাত্রা করেন। সেখান থেকে বিহারের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে দশমাস কাজ করেন। তিনি চেয়েছিলেন বিদেশে গিয়ে আরেক মুক্তিসংগ্রামী লালা হরদয়ালের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তিনি তাঁর এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে যান।

রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাকউল্লা খানের সম্প্রীতির ঘটনা শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে দৃশ্যত ছিল, তা নয়। গ্রেপ্তারের পর জেলবন্দী জীবন থেকে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব জয় করেছিল সাম্প্রদায়িকতাকে। রামপ্রসাদ বিসমিলকে রাখা হয়েছিল গোরক্ষপুর জেলে, অপরদিকে আসফাকউল্লাকে ফৈজাবাদ জেলে। জেল আলাদা হলেও ফাঁসির দড়ি তাঁদের মিলিয়ে দিয়েছিল মৃত্যুপথযাত্রায়। একদিকে বিসমিল ছিলেন আর্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত সনাতনী হিন্দু। অপরদিকে আসফাকউল্লা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মুসলিম। আসফাকউল্লা জেলে ধর্ম পালনের মাধ্যমে দিন কাটাতেন। দাড়ি রেখে নামাজ, রোজা, কোরান পাঠ করতেন। কিন্তু একে অন্যের ধর্ম সম্পর্কে কেউ কোনোদিন উচ্চবাচ্য করেননি। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যে ছিল। দুজনেই স্বপ্ন দেখেছিলেন নতুন এক ভারতের যা ধর্ম-জাতপাতের বেড়াজাল কাটিয়ে উন্নতির শিখরে উঠবে।

রামপ্রসাদ বিসমিলের আত্মজীবনী ও আসফাকউল্লার ডায়রিতে তাঁদের বন্ধুত্বের নির্দশন অমর হয়ে আছে। ইংরেজরা বিচারকার্যের সুবিধার্থে জেলের ভেতর ধর্মের রাজনীতি চালিয়েছে। তদন্তের কাজ হাসিল করতে চিরাচরিত ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতেও পিছপা হয়নি। পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট তাদাসুক হোসেন, ক্রমাগত রামপ্রসাদ এবং আসফাকউল্লার মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভূমিকা দেখাতে চেষ্টা করেন। তিনি আসফাকউল্লার কানে বিষ ঢালতে গিয়ে বলেন, "একজন মুসলমান হিসেবে আমি তোমার গ্রেপ্তারিতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। তুমি রাজসাক্ষী হয়ে যাও, তোমার মুক্তির ব্যবস্থা আমি করে দেবো। কাফের রামপ্রসাদ বিসমিলের লক্ষ্য হিন্দু ভারত। তুমি ওর সঙ্গ দিও না।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে আসফাকউল্লাহ তাদাসুক হোসেনকে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি এই ভারতেই মরতে চাই। রামপ্রসাদের একমাত্র লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা। সে আমার ভাই। তাঁকে তুমি কাফের বললে। এখুনি সরে যাও নইলে আমার নামে আরেকটা খুনের মামলা শুরু করতে হবে। আসফাকউল্লা আরও বলেছিলেন, "সাহেব, আপনার চেয়ে রামপ্রসাদকে আমি বেশি চিনি। এটুকু বুঝি যে, ইংরেজের পা চাটা কুকুর হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে রামপ্রসাদের ভারতবর্ষে (হিন্দু ভারতে) মরে যাওয়া অনেক ভালো। রামপ্রসাদ বিসমিলের আত্মজীবনীর বেশীরভাগ অংশ জুড়ে ছিল আসফাকউল্লার সঙ্গে বন্ধুত্বের নানা দিক। যৌথ সংগ্রামের বিভিন্ন উল্লেখ ছিল তাতে। রামপ্রসাদ আসফাকউল্লা সম্পর্কে লিখেছেন, আমার ভাই, মাতৃভূমির পরাধীনতা মোচনে যে নিজেকে বলি দেয়, তাঁর কাছে ফাঁসীর দড়ি যেন জয়ের মালা। আসফাকউল্লার ডায়রির পাতায় দুজনের মনের যে ভাবনা ফুটে উঠেছিল সেটি হলো- "বিসমিল হিন্দু, সে বলে আবার ফিরে আসবে। ভারতকে মুক্ত করবে ইংরেজদের হাত থেকে। কিন্তু আমি মুসলিম, পুনর্জন্ম মানি না। কখনও যদি আল্লাহর সাথে দেখা হয়, আমি বলবো জন্নাত চাই না, আমায় একবার ভারতবাসী হয়ে জন্মাবার সুযোগ দেওয়া হোক। আমি স্বচক্ষে ইংরেজমুক্ত ভারতবর্ষ দেখতে চাই।"

রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাকউল্লা দুজনের সময়কালে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার যে হাতছানি ছিল তাতে তাঁদের মধ্যেও ধর্মীয় বিভাজনগত অবস্থান নেওয়ার রসদ মজুত ছিল। কিন্তু তাঁদের ইতিহাসে কান পাতলে শোনা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ যা গড়ে উঠেছিল তাঁদের বন্ধুত্বের প্রগাঢ় অনুরণন-এ। সত্যিই দুজনের বন্ধুত্ব ছিল দেশপ্রেম-এর স্রোতে ভাসমান প্রকৃত "দোস্তোজী"। আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের অমৃত ধারায় তাঁদের বীরত্বপূর্ণ মুক্তি-সংগ্রামের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শনও চির অমর হয়ে থাকুক।

সিনেমার পলাশ ও শফিকুলের সম্প্রীতির ভাবনা এবং বাস্তব ইতিহাসের দুই মুক্তিসংগ্রামী রামপ্রসাদ ও আশফাকউল্লার জীবনপ্রবাহ যে বার্তা বহন করছে তা পাঠকসহ সকল ভারতবাসীর মনে অনুরণিত হোক–এই প্রার্থনা।

পুরী ভ্রমণের স্মৃতি

রাকেশ ধর, ৫ম সেমিস্টার (ইতিহাস)

"বিশ্বভুবন মনমোহন বলে কাছে আই

চার দেওয়ালের গণ্ডি ছেড়ে তাইতো ছুটে যায়।"

ভূমিকা ঃ মানুষ চিরকাল সুদূর পথের যাত্রী। তার রক্তে বাজে রবীন্দ্রথের গান-"আমি চঞ্চল হে, আমি সদূরের পিয়াসী।" গৃহের সীমা মানুষকে বদ্ধ করে রাখতে পারে না। দূর আকাশ, দূরদিগন্ত, দূরভুবন হাতছানি দিয়ে ডাকে পিঞ্জরের পাখিকে। কিন্তু পথ থাকলেও অনেক সময় পথের বন্ধু জোটে না। তবু মনপাখি বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে। তাই উষর মরু পেরিয়ে, দুর্গম হিমালয় জয় করে, কৃষ্ণবর্ণ অরণ্যে মশাল জ্বেলে পথ খুঁজে আজীবন সে বেড়াতে ভালোবাসে। মনুষ্যজন্মে আমি নিজের রক্তেও অনুভব করছি সেই বেড়ানোর নেশা। ছোটোবেলা থেকে অনেকবার পাহাড় দেখেছি, সমুদ্র দেখা হয়নি, প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে, টিভি রেডিওতে শুনেছি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখা হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ পুজোর ছুটিতে বাবা বলল, পুরী যাব, আনন্দে আমার মন নেচে উঠল, পুরী মানে তো সমুদ্র শুরু হল দিনগোনা।

যাত্রাশুরু ঃ

"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে

কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে"

অক্টোবরের তেইশ তারিখ আমরা রওনা দিলাম পুরীর উদ্দেশ্যে। উরু উরু মন দূরু দূরু বুকে আমরা ট্রেনে উঠে পড়লাম। আমাদের নিয়ে ট্রেন নির্দিষ্ট প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে পড়ল। সমুদ্র দেখার উত্তেজনাতে আমার সারারাত কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে সকাল নটার আগে পৌঁছে গেলাম পুরী। সমুদ্রের ধারে আমাদের হোটেল বুক করা ছিল। স্টেশন থেকে নেমে রিকশায় প্রথম সমুদ্র দর্শন।

কিছুদূর যাওয়ার পর কানে এল আমার সেই কাঙ্খিত সমুদ্র, আমার স্বপ্নের ইচ্ছা। চোখে পড়ল অন্তহীন নীলের বিস্তার। সাদা ফেনা বুকে নিয়ে ছুটে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। যতদূর দেখা যায় জল আর জল। হোটেলে পৌঁছে বেরিয়ে পড়লাম। সমুদ্রতীরে সেখানে নানা মানুষ নানা কাজে ব্যস্ত। আমি দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ গর্জন করে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। আমার রবি ঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল ঃ

'হে আদি জননী, সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার, একমাত্র কন্যাতব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি তার চক্ষে তব, তহি বক্ষ জুড়ি শঙ্কা, সদা আশা, সদা আন্দোলন'। হঠাৎ একটা ঢেউ আমার পা ভিজিয়ে দিয়েছে। আমি অঞ্জলি ভরে সেই জল তুলে নিলাম। সমুদ্রে স্নান করে দেহ মন আনন্দে ভরে গেল সমুদ্রতীরে রাতের সমুদ্র বড়োই অপরূপ মনোহর।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ ঃ

আমার হৃদয় ময়ূরের মতো নাচছে। পরদিন খুব সকালে আমরা বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশের জায়গাগুলি দেখতে। দেখলাম ধবলগিরি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন ও কোনারক। কোনারক সূর্যমন্দির আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করল। নাম না জানা শিল্পীর হাতের কারুকার্যে আমি অভিভূত তাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম বিদায়ের আগের দিন। পরদিন দেখলাম সূর্যোদয় সমুদ্রে মিশে থাকা জবাকুসুমের মতো লাল হয়ে থাকা সূর্যকে। বিকেলে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ দেখলাম ও হোটেলে ফিরে এলাম।

উপসংহার ঃ

পরদিন আমাদের ফেরার টিকিট। সেদিন সকাল থেকে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছি আমি সমুদ্রের ধারে, দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। যে পথ দিয়েই এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে যাওয়া। রিক্সায় যেতে যেতে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সমুদ্রের দিকেই তাকিয়েছিলাম। তারপর তাকে আর দেখাতে পেলাম না। শুধু একটা বড়ো ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। সেই শব্দে বিচ্ছেদের কান্না ছিল। আর ছিল আবার ফিরে আসার আমন্ত্রণ।

ইতিহাসে নারীচরিত্রের অস্তিত্ব

মায়া বৈরাগ্য, ৫ম সেমিস্টার (ইতিহাস)

কয়েক দশক আগেও ইতিহাস ছিল শুধুমাত্র পুরুষের আখ্যান। ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল যুদ্ধ, কূটনীতি, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় পুরুষের কীর্তিকলাপের উপর। এই সব ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে নারী ছিল অনুপস্থিত। পিতৃতন্ত্র মেয়েদের ঠেলে দিয়েছিল গৃহকোণে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেদিয়েছিল গাঁহস্থ্যের পরিসর ফলে ইতিহাস হয়ে যায় His Story। বিশ শতকের ষাটের দশকে নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গের অঙ্গ হিসেবে পাশ্চাত্যের বিদ্যায়তনিক পরিসরে মানবী ইতিহাসচর্চার আত্মপ্রকাশ ঘটাল। এর উদ্দেশ্য হল বিস্মৃতির আড়াল থেকে নারীদের উদ্ধার করে নারী ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা। নারীর ইতিহাসই ইতিহাসে নারী চরিত্রের অস্তিত্বকে স্পষ্ট করে তুলেছে। নারীর ইতিহাস হল এমন এক ধরনের ইতিহাস যেখানে নারীরা ইতিহাসে কী ভূমিকা পালন করেছেন এবং কোন উপায়ে তা করেছেন তারই আলোচ্য বিষয়। নারীর অধিকার আদায়ের ইতিহাস, একক দলগত ভাবে ইতিহাসে নারীদের গুরুত্ব পর্যালোচনার এবং তাদের উপর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব নারী ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। নারী ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমাজে নারীর অবস্থান, মর্যাদা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

বৈদিক সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক তাই পুরুষ শাসিত সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকার আশা করা যায় না। গৃহস্থের বাইরে নারীদের ক্ষমতা খর্ব করা হলেও গৃহস্থালীতে নারীরাই ছিলেন সর্বময় কর্ত্রী। গৃহস্থের নানা কাজে তারা পুরুষদের সাহায্য করত। এমনকি অন্তঃপুরের বাইরেও নারীরা পুরুষদের সাহায্য করত। সে যুগে নারীরা সামরিক ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়। নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল। ঋক্‌বৈদিক যুগের বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, মমতা—প্রমুখ মহিলারা আজও ইতিহাসে চর্চিত, যারা বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুপত্তি অর্জন করেছিলেন। বৈদিক যুগে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চর্চার অধিকার থেকেও নারীদের বঞ্চিত করা হত না। কিন্তু ঋক্‌বেদে সতীদাহ প্রথার উপস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায়। মহিলারা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। বৈদিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান গুলি থেকে জানা যায় যে সে যুগের নারীদের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত ছিল এবং তারা, সামাজিক সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন।

তবে পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীদের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। কন্যা সন্তানকে সানন্দে গ্রহণ করা হত না, তারা পুত্র কামনা করতেন। এই সময় থেকেই নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেন, তাদের পুরুষ নির্ভর জীবন শুরু হয়। এই সময় নারীরা ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি থেকে বঞ্চিত ছিল। প্রতিকূলতা সত্বেও সে যুগে কয়েকজন নারী জ্ঞান ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছিলেন। এদের মধ্যে মৈত্রী ও গার্গী বাচক্লবীর নাম আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। সে যুগের নারীরা নৃত্য, সংগীত, অঙ্কন প্রভৃতি শিল্পকলার মধ্যে যুক্ত থাকত। সে কালে বিধবা বিবাহের বিধান ছিল, ফলে সতীপ্রথা সমাজে খুব একটা জনপ্রিয়তা ছিল না।

উনিশ শতকে এসেও নারীরা সেই সতীদাহ প্রথার শিকার হয়েছে, শিকার হয়েছে বাল্য বিবাহের। তবে উনিশ শতকে নারীদের জন্য নতুন আলোর বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর। রামমোহনের হাত ধরে নারী সমাজ সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহের হাত থেকে মুক্তি পায়। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের সাহায্যে প্রচলিত হয় বিধবাবিবাহ আইন। শুধু তাই নয় তিনি উপলব্ধি করেন যে শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির মুক্তি সম্ভব

নয়, তাই তিনি নারী শিক্ষায় নিজেকে উজার করে দিয়েছিলেন। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ফলে মেয়েরা গৃহের চৌকাঠ পেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। আর প্রথম দিকে শিক্ষকতাই ছিল মেয়েদের প্রথম পেশা। এই ব্যাপারে চন্দ্রমুখী বসু ও তটিনী দাস ছিলেন অগ্রগন্যা। শুধুমাত্র শিক্ষা নয় ঔপনিবেশিক আমলে দেশকে স্বাধীন করতে নারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীনাপাণি, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ নারীর নাম উল্লেখযোগ, স্বদেশী আন্দোলন ছিল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। নবজাগরণের প্রতিশ্রুতি হিসেবে মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসার পথ সুগম হয়। স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষ অপেক্ষা কম ছিল না। এদের মধ্যে সরলাদেবী চৌধুরানি, অম্বুজা সুন্দরী দাসগুপ্ত, লাবণ্য প্রভাকর, লীলাবতি মিত্র নারী স্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রমুখ ভূমিকা পালন করেছে। স্বদেশীযুগের বাতাবরণে নারী পুরুষের সম্পর্কে যে একটি বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল তা ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" উপন্যাসে, "স্ত্রীরপত্র" নামে ছোট গল্পে এবং "সরলা" নামক কবিতায়। অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অরন্ধনের ডাক ছিল নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিকী ঐক্যের বার্তা। আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, প্রভৃতি লেখনীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীরাও কম যায় না। এব্যাপারে মণিকুন্তলা সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিক কালপর্বে তারাবাই শিন্তে রুখমাবাই প্রমুখ মারাঠি মহিলা তাদের লেখনী ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

একবিংশ শতাব্দীতেও যখন মানুষ বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অপরিসীম উন্নতি সাধন করেছে, শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি যখন চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে তখনও সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে আমাদের দেশে নারী-পুরুষের অনাকাঙ্খিত প্রভেদ বিদ্যমান। আধুনিক কালে সর্বক্ষেত্রে চরম উন্নত সমাজে আজও নারীরা লাঞ্ছিত অপমানিত, অবহেলিত। কিভাবে শুধুমাত্র মানুষের এক বিভেদহীন সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় তারই জন্য চেষ্টা করতে হবে। নারীবাদী তত্ত্বকে হাতিয়ার করে মানবী ইতিহাস চর্চাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে 'নারীপ্রশ্ন' একটি ইস্যু (issue) হিসাবে দেখা যায়। কিন্তু ১৯৭০ এর দশকে এটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়। এর মূল কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি আমেরিকা ও ইউরোপে Womens' Liberation Movement এর শুরু হওয়া। বিগত শতকের শেষ দিক থেকে কেবল উন্নত দেশগুলিতে নয় উন্নয়নশীল দেশ গুলোতেও নারীজাগরনের সূচনা হয়েছে। সারা পৃথিবীর নারীসমাজ আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে পুরুষের সমঅধিকার দাবী করেছে। কাজেই 'নারীপ্রশ্ন' আজ স্থানীয় ও জাতীয় পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। আজ তা আন্তর্জাতিক এজেণ্ডায় পরিনত হয়েছে।

ছিন্নমস্তা পূজা ও তার ইতিহাস

সৌম্যদ্বীপ হালদার, ১ম সেমিস্টার (ইতিহাস)

কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই বঙ্গভূমিতে কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদির সাথে ছিন্নমস্তা পূজার কথা এসে যায়। ছিন্নমস্তা মায়ের কথা বলতে পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মাতা পার্বতীর পিতা প্রজাপতি মহারাজ দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন, সেই যজ্ঞে স্বর্গের সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করলেও জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করলেন না, মাতা পার্বতী দুঃখ পেলেন তথাপি বিনা নিমন্ত্রণে যজ্ঞে যাওয়ার জন্য শিবের কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়াতে অন্য পথে কৌশল অবলম্বন করেন। দেবী তখন তাঁর রূপের দশম বিদ্যার শেষ রূপ ছিন্নমস্তা রূপ প্রদর্শন করলেন শিব ভয়পান এবং দেবীকে পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। মাতা পার্বতী পিত্রালয়ে যেয়ে দেখেন পিতার শিবহীন যজ্ঞ। বিনা অনুমতিতে সতীর আগমনকে মহারাজ দক্ষ মেনে নিতে পারলেন না পড়ন্তু কটু বাক্যে সতীকে তিরস্কার করলেন এবং শিবকে নিন্দা করলেন। স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী পিতৃ গৃহে দেহত্যাগ করলেন। শাস্ত্র মতে এই ঘটনার ব্যাখ্যা বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারে।

নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত গরীবপুর গ্রামের ছিন্নমস্তার পূজা অন্য একটা সাক্ষ্য বহন করে উপরের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত বা পৌরাণিক তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা দেখা যায় না। স্থানীয় বসবাস কারীদের মুখ হতে শোনা কিছু কথা এখানে পরিবেশন করা হলো। এই ছিন্নমস্তা মায়ের পূজার ফেলে আসা অতীত।

অবিভক্ত ভারতবর্ষ বাংলার নদীয়া জেলার অন্তর্গত পাঁচটা মহকুমার মধ্যে অন্যতম একটা মহকুমা নম মেহেরপুর, স্রোতস্বিনী ভৈরব নদীর পাড়ে এই মেহেরপুর। তার পাশে সবুজ ঘেরা ছবির মত একটা গ্রাম দরিয়াপুর।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ধনী জমিদার ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষের গ্রাম। গ্রামের মধ্যে কালীমন্দির, শতাব্দী প্রাচীন কালীমা পূজার পীঠস্থান। মন্দিরে পূজারী ছিলেন সত্যনারায়ণ মুখার্জী। এই মুখার্জী পরিবার বহু বছর ধরে পূজা করে আসছেন। একদিন পুরোহিত মশাই সকালবেলা নিত্য পূজা করতে এসে দেখেন মন্দিরের দরজা খোলা। ভেতরে এসে দেখেন মায়ের মূর্তি ভাঙা, মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এই দৃশ্য দেখে কাঁদতে লাগলেন সাথে সাথে আশেপাশের গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করলেন এবং মেহেরপুর থানায় নিয়ে অভিযোগ জানালেন, প্রশাসন তৎপরতার সাথে ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করলেন, মেহেরপুর কোর্টে বিচারে অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাগারে বন্দী হলো, লোকমুখে শোনা যায় অভিযুক্তদের শরীরে পচন ক্রিয়া হয় এবং তাদের কারাগারে মৃত্যু হয়। ভগ্ন কালীমা মূর্তি পূজা করতে পুরোহিত মহাশয় অসমর্থ হলে কালীমা মাতার পূজা বন্ধ হয়ে যায়। বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এক রাত্রিতে পুরোহিত সত্যনারায়ণ মুখার্জী মহাশয়ের স্বপ্নাদেশ হয়। স্বয়ং মা কালীমা আদেশ দেন, যে তাকে ছিন্নমস্তা রূপে পূজা করতে, পুরোহিত বলেন তিনি এই পূজার বিধান জানেন না। মা তখন পুরোহিতকে বললেন এই পূজার বিধান পাওয়া যাবে উত্তর প্রদেশের কাশীতে। কাশীতে তিনি মা ছিন্নমস্তা রূপে দীর্ঘ কাল পূজিত হয়ে আসছেন।

তখনকার সময় রাস্তাঘাট ভালো ছিল না, ট্রেন, বাস ইত্যাদির চলার সুযোগ সুবিধা না থাকাতে মায়ের আদেশে দুর্গম পথে পদব্রজে রওনা দিলেন দরিয়ারপুর গ্রাম থেকে কাশীর পথে। দীর্ঘ দুই তিন মাস চলার পর কখনো পায়ে হেঁটে কখনো জলপথে অতিক্রম করে ক্লান্ত শরীরে কাশি পৌঁছান। ইহা ভাবতে সত্যই অবাক লাগে। কাশী পৌঁছিয়ে মা ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের সাথে সাক্ষাৎ করেন, ওনাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলেন। মায়ের স্বপ্নাদেশের কথাও উল্লেখ করেন। মন্দিরের পুরোহিত মশাই অতি সহানুভূতির সাথে তার বক্তব্য শুনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন তিনি মা ছিন্নমস্তাবস্থার দিকে তাকিয়ে।

মায়ের কি ইচ্ছা জানতে চাইলেন ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। অনেকটা সময় অতিক্রম হওয়ার পর চোখ খুললেন এবং পুরোহিত সত্যনারায়ণ মহাশয়কে মন্দির প্রাঙ্গনে বসতে অনুরোধ করে মায়ের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন। কয়েক ঘন্টা পর পুরোহিত মহাশয় কাশীর প্রধান পুরোহিত গর্ভগৃহ থেকে বাহির হয়ে তালপাতা ও গাছের ছালের উপর লেখা তৈরি একখানি পুঁথি পুরোহিত মুখার্জী মহাশয়কে প্রদান করলেন। বললেন মা ছিন্নমস্তা মায়ের পূজার বিধান এই পুঁথিতে সব লেখা আছে। আপনি নিজের জায়গায় ফিরে যান মায়ের ছিন্নমস্তা রূপে মূর্তি তৈরি করে বৈদিক মন্ত্রে পূজা করেন নিষ্ঠার সাথে। পুরোহিত সত্যনারায়ণের আনন্দে চোখের জল এলো বাচ্চা ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে মাকে প্রণাম করে দেশের দিকে রওনা দিলেন।

এলো বহু প্রতীক্ষিত শুভদিন। স্থানীয় মূর্তি শিল্পী রমাকান্ত পালকে দিয়ে ছিন্নমস্তা মূর্তি তৈরি করে মা কালীমার স্থলে ছিন্নমস্তা রূপী দেবী ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধুমধাম এর সাথে পূজা পুনরায় শুরু হয়। আনন্দের জোয়ারে দেশ প্লাবিত হলো, পূজা ও মেলা এক নাগাড়ে চলল এক মাস ধরে। সকল সম্প্রদায়ের উপস্থিতিতে মুখরিত হল এই আনন্দ ধাম। আবার নতুন করে সবকিছু শুরু হল বহুদূর দেশ দেশান্তর হতে লোক আসতে লাগল পূজা মন্দিরে। এই ভাবে কেটে গেল বহু বছর।

১৯৪৭ সাল ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, ভারত দ্বিখন্ডিত হয়ে নতুন একটা রাষ্ট্র জন্ম দিল নাম পাকিস্তান। বাংলাও বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান বলে পরিচিত হল। তেমন পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান হল। এই দেশ ভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান হতে কাতারে কাতারে হিন্দু বাঙ্গালীদের পশ্চিমবাংলাতে আসতে হল সহায় সম্বল ছেড়ে। সে এক মর্মান্তিক কাহিনী। মেহেরপুরের আশেপাশের গ্রামের জনগণ এপার বাংলায় এসে তেহট্ট থানার আশেপাশের গ্রামে আশ্রয় নিল। দড়িয়ারপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এপারে নাটনা গরীবপুর গোপালপুর হাউলিয়া গ্রামে আশ্রয় নিল।

তার পর কয়েকটা বছর কেটে গেল নিজেদের সামলে নিতে। ১৯৫২ সাল একটা তাৎপর্যপূর্ণ বছর। দরিয়াপুর নিবাসী শ্রী নন্দগোপাল বিশ্বাস, রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শিশির বিশ্বাস, নিতাই ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও আশেপাশের গ্রামের মানুষরা প্রস্তাব রাখেন যে ওপার বাংলায় দরিয়াপুরে ফেলে আসা ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দির গরিবপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে মায়ের পূজা করা হোক। গুরু দায়িত্ব দেওয়া হলো স্বর্গীয় পুরোহিত সত্যনারায়ণ মুখার্জীর পুত্র অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জীকে (ভন্ডি ঠাকুরকে)। তখন তিনি বিধান চান যে দরিয়াপুর গ্রামে মা ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরের বেদীর মাটি লাগবে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠানে। তখন মাটি আনার দায়িত্ব নেন শ্রীপদ দাস নামে এক ব্যক্তি এবং ওখান থেকে এক বালতি মাটি নিয়ে আসেন, বর্তমান ছিন্নমস্তা মাতার গরিবপুর বেদীর নিচে ঐ মাটি প্রতিস্থাপন করা হয়। শ্রী রমাকান্ত পাল মহাশয় মায়ের মূর্তি নির্মাণ করেন। একটা খড়ের ঘর ঝাঁপের বেড়া দিয়ে তৈরি করে মায়ের মন্দির প্রতির্ষ্ঠিত হয়। ঝাঁপের বেড়া দিয়ে তৈরি মন্দির জনগণের প্রচেষ্টায় আজ একটা পাকা মন্দির নির্মিত হয়েছে।

গরীবপুরের ছিন্নমস্তা পূজা ৭০ বছর পূর্ণ হল। প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে পূজা আরম্ভ হয় এবং একমাস থাকে। বর্তমানে এই মন্দিরের পূজারী হল সত্যনারায়ণ মুখার্জীর পুত্র অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর দুই পুত্র শ্যামাকান্ত মুখার্জী ও লালমোহন মুখার্জী। স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জীও বিগত ২০-২৫ বছর পূজা অর্চনা করে গেছেন। বর্তমানে ছিন্নমস্তা মায়ের মূর্তি তৈরি করেন স্বর্গীয় রামকান্ত পালের পুত্র কার্তিক চন্দ্র পাল। দর্শকদের বা জনগণকে আরও একটি কথা বলতে চাই সত্যনারায়ণ মুখার্জী আজ থেকে আনুমানিক একশত বছর আগে কাশিতে গিয়ে কাশির ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিকট হতে যে তালপাতা ও গাছের ছালে লিখিত মায়ের পূজার বিধান ও বৈদিক মন্ত্র পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তা আজও এই মুখার্জী পরিবারের কাছে গচ্ছিত আছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি নারী

রাকেশ ধর, ৫ম সেমিস্টার (ইতিহাস)

"আমি নারী বলে আমাকে ভয় করো না?
বিদ্যুৎ শিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন"

স্বাধীনতা দিবসের দিনটিকে প্রতিবছর আমরা বেশ আড়ম্বরের সাথেই পালন করে থাকি। লালকেল্লা থেকে আজ পাড়া গ্রাম, ছোট থেকে বড় নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে আর সেই অনুষ্ঠানে স্মরণ হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছেন যে এই বিপ্লবীদের মধ্যে নারীদের ভূমিকা কি? তার মধ্যে বাঙালি নারীর ভূমিকা ঠিক কতটা? আমরা ভুলে গেছি সেই মহান বাঙালি নারীদের আত্মবিসর্জনের কথা। যাঁরা তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য। এমনি বেশ কয়েকজন বাঙালি নারীর স্বাধীনতা সংগ্রাম রয়েছেন যাঁদের আমরা অনেকে হয়তো জানিই না। আবার যাঁদের সম্পর্কে জানি তাঁদেরকে হয়তো ভুলতে বসেছি, তাঁদেরকে হারিয়ে ফেলেছি ইতিহাসের পাতায়। তাই আমরা আজকে সেই সব সংগ্রামী নারীদের কথা আলোচনা করব যারা সত্যিকারের চেতনা এবং অদম্য সাহসিকতা সহ লড়াই করেছিল। এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন বেদনা শোষণ এবং যন্ত্রনার মুখোমুখি হয়েছিল।

বিপ্লবী বীনা দাস

১৯১১ সালের ২৪ শে আগস্ট কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বাংলার এই স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী বীনা দাস। পিতা বেণীমাধব দাস একজন সমাজসেবী ও শিক্ষক ও মাতা সরলা দেবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে ১৯৩২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর গুলি চালিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন পরবর্তীতে বীনা দেবী যোগ দিয়েছিল জাতীয় কংগ্রেসে।

ননিবালা দেবী

ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৮ সালে হাওড়ার বালিতে। খুব অল্প বয়সে বিবাহ হয় এবং ১৬ বছর বয়সে বিধবা হন। তিনি বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জীর কাছ থেকে বিপ্লবী হওয়ার দীক্ষা নেন। বিপ্লবী হিসেবে রামচন্দ্র বাবুর স্ত্রী সেজে জেলে গিয়ে পিস্তলের খোঁজ নিয়ে আসা তার একটি কাজ। তাঁর শেষ জীবন খুব অবহেলার সঙ্গে কেটেছিল তাকে কেউ আশ্রয় দেয়নি। তার মৃত্যুর সঠিক তথ্য এখনো জানা যায়নি।

মাতঙ্গিনী হাজরা

মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন মেদিনীপুরের এক মহিয়সী বীরাঙ্গনা ১৮ বছর বয়সে বিধবা হলেও দেশের প্রতি ছিল এক নিবিড় ভালোবাসা। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরের এক বিরাট মিছিলের সর্বাগ্রে তিনি জাতীয় পতাকা হাতে নেতৃত্ব দেন। পুলিশের গুলি লাগা সত্ত্বেও তিনি জাতীয় পতাকা ভূমিষ্ঠ হতে দেননি। অবশেষে আরেকটি গুলির আঘাতে ভারত মাতার কোলে লুটিয়ে পড়ে এই বীরাঙ্গনা।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

পূর্ববঙ্গের মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম মহিলা বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯৩২ সালে ৮ জন সঙ্গী নিয়ে তিনি ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেন। সেখানে রক্ষীদের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এবং পালাতে না পেরে পটাশিয়াম সাইনাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

দুকড়িবালা দেবী

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন নারী বিপ্লবী যিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম দিকের নারী বিপ্লবী এবং ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত নারী।

কল্যাণী দাস

ব্রিটিশ বিরোধী অগ্নিযুগের নারী বিপ্লবী কল্যাণী দাস। যিনি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বীনা দাসের বোন ছিলেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে এবং বন্দী হয়। তিনি ছাত্রী সংঘের উদ্যোক্তা। ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির জন্য কারাবরণ করেন।

কমলা দাশগুপ্ত (১৯০৭—২০০০)

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কাটান জেলে। তিনি ছোটবেলা থেকে দেশপ্রেমী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশদের ওপর আঘাত হানাবার জন্য ট্রাংক ভর্তি বোমা লুকিয়ে রাখতেন। এছাড়া তিনি ডালহৌসি স্কোয়ার মামলায় যুক্ত ছিলেন। তিনি কুখ্যাত কলকাতার কমিশনার চার্লস চৌগরকে মারতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়।

শান্তি ঘোষ (১৯১৬—১৯৮৯) **ও সুনীতি চৌধুরী** (১৯১৭—১৯৮৮)

সশস্ত্র বিপ্লবের দুই মহিলা সৈনিক শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। তাঁরা দেশত্ববোধক গানে তা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এবং কুমিল্লা জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনে তাদের কিশোরীমন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা রিভালবার চালানো শিখেছিল কুমিল্লা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে তাঁর বাংলোতে গিয়ে সামনে থেকে গুলি করেছিল। পরবর্তীতে শান্তিকে দ্বিতীয় শ্রেণি ও সুনীতিকে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদিতে পরিণত করেছিল।

কল্পনা দত্ত (১৯১৩—১৯৯৫)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন এবং কারাদণ্ডিত হন। তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

সুশীলা মিত্র (১৮৯৩—১৯৪৮)

কোন অস্ত্র না ধরেও যে কত বড়ো আত্মত্যাগ করা যায় তা বুঝেছিলেন ত্রিপুরার আসাকাটির সুশীলা মিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পলাতক বিপ্লবীদের তিনি আশ্রয় দিতেন। তিনি দেশের কাজে নিয়জিত করেছিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

লতিকা ঘোষ (১৯০২—১৯৮৩)

অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে লতিকা ঘোষ। তিনি জাতীয়তাবাদী মনোভাবের জন্য বেথুন কলেজের চাকরি ছেড়ে গোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতেন।

দৌলতউন্মেষা

যশোরের দৌলতউন্মেষা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতেন। এই ব্যক্তি ১৪ বছর বয়সে আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। তাকে ফুলছড়ি গ্রামের সভা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুক্তি পাওয়ার পর গোপনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল।

ফুলবাহার বিবি

ঢাকার বিক্রমপুরের ফুলবাহার বিবি আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল ও গ্রেপ্তার হয়েছিল। কিছুদিন কারাবাসও করেছিল। তিনি বড়ো ভাইয়ের কাছে স্বাধীনতার দীক্ষা নেওয়ার পর শুরু করেছিল অভিযান।

নির্মলনলিনী দেবী

ব্রিটিশ সরকারের টাকায় জীবনধারণ করবে না বলে কলেজের অধ্যাপক ছেড়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত কৃষ্ণনগরের নির্মলনলিনী দেবী। তিনি মহিলাদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করেন ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

চামেলী গুপ্ত ও কুসুম বাগদি

চামেলী গুপ্ত কলকাতার নারী সত্যাগ্রহের সমিতির সদস্য ছিলেন। মেদিনীপুরের কুসুম বাগদী দশমাসের শিশুকে বাড়িতে রেখে জেলে এসেছিলেন আইন অমান্য আন্দোলন করে। তিনি দেশের কাজেও শিশুর পিছুন টান রাখেনি। চামেলি গুপ্ত বড়বাজারের পুরুষের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে বিদ্রোহ করায় গর্ভাবস্থায় আটক হয়। জেলে তাঁর পুত্র ও তিনি দুজনে মারা গিয়েছিল। দেশের জন্য আত্মত্যাগের ব্যথা না স্মৃতিতে, না খাতাতে কোথাও লেখা রইল না।

এরা ছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার হাজার নারীর অবদান ছিল। কিন্তু বেশিরভাগই পর্দার আড়ালে রয়েগেছেন। ঘরে ও বাহিরে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের পাশাপাশি এরা মেয়েদের কল্যাণ করে গেছেন বহু কল্যাণ কাজে শুধুমাত্র পুরুষ তান্ত্রিক বা শুধু নারীবাদী দিয়ে সমাজ এগোয় না, সমাজ এগোয় যখন আমরা সবাইকে সম্মান দিয়ে একসাথে দিনগুলোতে বেঁচে থাকার লড়াইটি জারি রাখি।

তাই দেশের সেই সংগ্রামী বীরবালাদের আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

দার্জিলিং এর পাঁচটা দিন

সুনীতা মণ্ডল, ৩য় সেমিস্টার (**ইতিহাস**)

সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে মানুষের কাছে ভ্রমণ একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার। প্রাচীনকালে মার্কোপলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়েই ইউরোপের মানুষ অজানাকে জানার নেশায় মেতে উঠেছিল। এছাড়াও বর্তমানে দৈনন্দিনের ধরা বাঁধা ব্যস্ত জীবন থেকে একটু অব্যাহতি পেতে হলে ভ্রমণে যাওয়া আবশ্যক। ভ্রমণ আমাদের মনকে প্রশমিত করে। যাইহোক, হাজার পাঁচ ভেবে চিন্তে মাসি আর দিদাকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্য দার্জিলিং। রাতে ১২ ঘন্টার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভোর ৪ টে নাগাদ তিনজন পৌছালাম NJP । সেখান থেকে এক কাপ চায়ের স্বাদ নিয়ে গাড়িতে করে সোজা ম্যালে পৌঁছে গেলাম। এখানেই সারা বেলা কেটে গেল শুধু একটা থাকার জায়গা ঠিক করতে যেহেতু আমরা Online-এ ঘর ভাড়া নিয়নি। খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বিকালে এখানকার বাজার, রাস্তা এবং যেহেতু এখানে ৫ দিন থাকার পরিকল্পনা করে এসেছি তাই প্রাথমিক প্রয়োজনীয় জিনিস গুলি কোথায় পাওয়া যাবে খুঁজে নিলাম। এখানে আসার সময় NJP তে পরিচয় হয়েছে এক নব্য বিবাহিত দম্পতির সাথে। তাদের সাথেই প্রথম দিন একটু মহাকাল মন্দির ও ঘুম মনাস্ট্রি থেকে ঘুরে আসলাম। এখানকার মানুষগুলো বেশ সুন্দর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছে। কথা বলে বুঝলাম এরা আমাদের ভাষা বুঝতে পারে কিন্তু ভালো বলতে পারে না। যাইহোক মহাকাল মন্দিরে প্রেক্ষাগৃহ ও পরিবেশ আমাদের নদীয়ার মন্দির থেকে ভিন্ন। এদের পূজা পদ্ধতি সবটা অন্যরকম তবে পাশে এক জায়গায় দেখলাম হনুমানের মন্দির আছে। অল্প সময়ের মধ্যে ওখান থেকে চলে আসলাম। এখানে খাবারের দাম আমাদের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি, যাইহোক এখনও ৪ দিন থাকতে হবে। একটা হোটেল পেয়েছি সেখানে খাবার খেয়ে শান্তি পাচ্ছিলাম কারণ আমাদের রান্নার সাথে অনেক মিল ছিল। এখানকার সবজির আকৃতি গঠন আমাদের চেনা জিনিস থেকে ভিন্ন। মহাকাল মন্দির থেকে ফেরার পথেই দেখলাম এখানকার অধিকতর কাজে মহিলারা যুক্ত। বিষয়টা ভালো লাগলো। পরের দিন তিনজন মিলে একটা গাড়ি নিলাম 5 Point দেখার জন্য। ঘুরে নিলাম Zoo, Rock Garden, বাতাসিয়া লুপ, Tea Garden আর পার্ক। সবকিছুর মাঝে এখানকার ফাস্টফুডের কথা বলতে ভুলে গেছি। মোমো তো অসাধারণ ছিল। এছাড়াও টেস্ট করার মত আরো অনেক কিছু— চিলি চিকেন, চাওমিন, ফুচকা, এগ রোল আরো কত কি এগুলোর স্বাদ ছিল ভিন্ন সুন্দর যা ইতিপূর্বে কোনদিন পায়নি। তবে সবকিছু আগে স্বাদ নিয়েছি কিন্তু কলকাতায়, বহরমপুর, নদীয়া অপেক্ষা দার্জিলিং যেন ভিন্ন। এখানকার রাস্তায় কুকুর গুলোও সুন্দর, মন চায় বাড়ি নিয়ে যাই। তৃতীয় দিন ঘোরার মত অনেক জায়গা ছিল তাই সকাল সকাল ঘুম স্টেশন থেকে গাড়ি নিয়ে ঘুরে নিলাম জাপানিস টেম্পেল পার্ক, Tea Garden আরো কিছু জায়গা সহ 7 Point এতকিছুর মধ্যে Tiger Hill যাওয়া হয়নি পর্যাপ্ত টাকার অভাবে। পরের দিন সকালে উঠে চলে গেলাম মহাকাল মন্দিরে পাশে একটা জায়গা শুধুমাত্র কাঞ্চনজঙ্ঘা View দেখবো বলে। দেখে শুধু বলতে ইচ্ছা করছিল কি রূপ দেখলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলবো না, অসাধারণ!

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য : ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা

সুনীতা মণ্ডল, ৩য় সেমিস্টার **(ইতিহাস)**

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সূচনা থেকে মগধ সাম্রাজ্যের উত্থান পর্যন্ত সময়কাল 'ষোড়শ মহাজনপদের যুগ' নামে পরিচিত। এই সময় উত্তর ভারতে পরস্পর বিবাদমান প্রায় ১৬টি মহাজন পদের উত্থান ঘটে। প্রথমদিকে এই ১৬টি মহাজনপদের মধ্যে অবন্তী বৎস, কোশল এবং মগধ আর্যাবর্তে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের সংগ্রামে সাফল্য অর্জনে সফল হলেও শেষ-পর্যন্ত একমাত্র মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই সফল হয়। মগধের বাসসাকর, কৌটিল্য, রাধাগুপ্ত প্রমুখ মন্ত্রীদের সুযোগ্য পরামর্শ ও হর্যঙ্ক বংশের বিম্বিসার, অজাতশত্রু শৈশুনাগ, শিশুনাগ, নন্দবংশের মহাপদ্মনন্দ এবং সর্বোপরি মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্র মৌর্য ও তাঁর উত্তরসূরি অশোক-এর দক্ষ নেতৃত্বে মগধ সাম্রাজ্য আর্যাবর্তে একছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ঐক্যবদ্ধ হতে সফল হয়েছিল।

৩২৪-১৮৬ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত প্রায় দেড়শো বছরের মৌর্য শাসন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণে ভারত যখন বিচলিত, উৎকণ্ঠিত, সেই রকম এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে সামান্য এক রাখাল বালক থেকে নন্দবংশের অত্যাচারী শাসক ধননন্দকে পরাজিত করে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার সংগ্রাম সহজ ছিল না। যাইহোক, কৌটিল্যের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত ৩২৪ খ্রিঃপূঃ তিনি ধননন্দকে পরাজিত করে মৌর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রভাবে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ধননন্দের কন্যা দুদ্ধরাকে বিবাহ করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সংগ্রাম এখানে থেমে থাকেনি। সিংহাসনে বসে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সময় থেকে কৌটিল্য তাঁর প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর রচিত "অর্থশাস্ত্র" প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এক আকর গ্রন্থ। যাইহোক, ৩২৩ খ্রিঃপূঃ আলেকজান্ডার মারা গেলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উত্তর পশ্চিম ভারতের সিন্ধু ও পাঞ্জাব থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করেন। পরবর্তীকালে সেলুকাস গ্রিকদের পূর্ব অধিকৃত স্থানগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য ৩০৫ খ্রিঃপূঃ সিন্ধু অঞ্চলে পৌঁছান। ঐতিহাসিক স্ট্র্যাবো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও সেলুকাসের মধ্যে হওয়া এক সন্ধির উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলুকাসকে ৫০০ হাতি উপহার দিয়েছিলেন এবং সেলুকাস নিজ কন্যা হেলেনার সাথে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিবাহ দেন এবং উপহার স্বরূপ কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বালচিস্তানের মাকরান প্রদান করেন। সেলুকাস গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসকে ৩০৪ খ্রিঃপূঃ থেকে ২৯৯ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে ছিলেন এবং 'ইন্ডিকা' নামে ভারত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বহির্বিশ্বের সঙ্গেও মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করেন।

মৌর্য সম্রাটরা এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। মৌর্য যুগে প্রথম উপমহাদেশীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। যাইহোক, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা, পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণে মহীশূর ও মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।। ইতিপূর্বে কোনও ভারতীয় নরপতির পক্ষে এতো বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাকে 'The first historical founder of a great empire in India' বলে অভিহিত করেছেন। অপর দিকে ডঃ ভিনসেন্ট স্মিত বলেন যে, 'The first Indian emperor, more than two thousand year ago thus entered into the possession of that 'scientific frontier' sighed for in vain by his English Suceessors and never held in its entirety even by the Mughal monarchs of the Sixteenth and Seventeenth centuries'

যুগ যুগ ধরে ভারতীয় রাজন্যবর্গ এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরা সম্রাট, একরাট, বিরাট, সার্বভৌম, রাজচক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। মগধের রাজন্যবর্গও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর আমলে এই আদর্শ পূর্ণতা পায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অশোক ও তাঁর উত্তরসূরিরা মৌর্য সাম্রাজ্যকে ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত করে রেখেছে। এই বীর সম্রাটের রাজত্বকাল ছিল পরবর্তীকালের মৌর্য সম্রাটদের কাছে আদর্শ স্বরূপ। সম্ভবত ৩০০ খ্রিঃপূঃ তিনি মারা যান।

তথ্যসূত্র ঃ

(১) দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক (কলকাতা), ১ম খণ্ড, ২০০০

(২) জীবন মুখোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, শ্রীধর পাবলিশার্স (কলকাতা), ২০১৪

(৩) A History of Ancient and Early Medieval India from the Stone Age to the 12th Centrure - Upinder Singh, Pearson (Delhi).

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুরহস্য

দিপাশ্রী বিশ্বাস, ৫ম সেমিস্টার (ইতিহাস)

"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব,"
- সুভাষচন্দ্র বসু

সালটা ১৮৯৭, জন্ম নেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চিরস্মরণীয় কিংবদন্তি নেতা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি হলেন এক উজ্জ্বল ও মহান চরিত্র যিনি এই সংগ্রামে নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি নেতাজি নামে সমধিক পরিচিত।

ঐতিহাসিকদের মতে, ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে বহনকারী জাপানি বিমান, জাপান শাসিত ফোরমোসায় (বর্তমান তাইওয়ান)। বিধ্বস্ত হওয়ার পর, আগুনে দগ্ধ হয়ে বসুর মৃত্যু ঘটে, তাঁর, তবে অনেক অনুগামীই বিশেষত বাংলায়, সে সময় ঘটনাটি অস্বীকার করে এবং এমনকি এখনো তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত পরিস্থিতি ও তথ্য অবিশ্বাস করে, তার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বহু ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আবির্ভূত হয় এবং দীর্ঘকাল এগুলো তার মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন কল্পকাহিনী জীবিত রেখেছে।

তাইহোকুতে দুপুর আড়াইটার দিকে যখন সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বোমারু বিমানটি উড়তে শুরু করে, তখনই এর যাত্রীরা বিমানটির ইঞ্জিন থেকে একটি বিকট শব্দ শুনতে পান। বিমানটি দ্রুত ডানদিকে ঝাঁকুনি দিয়ে এবং ভূমিতে বিধ্বস্ত হয়ে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আগুনে বিস্ফোরিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর দেহ জ্বালানিতে সিক্ত হয়ে ওঠে, বসু ও তার সহচর রহমান আগুনের মধ্য দিয়েই দৌড়ে সামনে দিয়ে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, বন্দরের লোকেরা দেখেন, সুভাষচন্দ্র বসু গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। জয়েস লেব্রার মতে,' একটা লরি যেটা অ্যাম্বুল্যান্স হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল, তা দ্রুত সুভাষচন্দ্র এবং অন্য যাত্রীদের তাইহোকুর দক্ষিণে নানমোন সৈনিক হাসপাতালে নিয়ে যায়।" হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় ও তার কিছুক্ষণ পরও সুভাষচন্দ্র বসু সচেতন ও সংহত ছিলেন, ডাঃ ইয়োশিমি এসে তৎক্ষনাৎ দেখলেন। বসুর শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ, বিশেষত তার বুকে তৃতীয় মাত্রার দহন সংঘটিত হয়েছে। এতে তার সন্দেহ হয় যে বসু বাঁচবেন কী না-পরবর্তীতে হাসপাতালের কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী ঐতিহাসিক লিওনার্ড গর্ডন এর বক্তব্য হল একটা জীবানুনাশক, রিভামল, তার শরীরের অধিকাংশ স্থানে লাগানো হয় এবং এরপর একটি সাদা মলম প্রয়োগ করে দেওয়া হয়। ডা. ইয়োশিমি, বসুর হৃদয়ের দুর্বলতার জন্য চারটি ভিটা ক্যাম্ফর এবং দুটো ডিজিটামাইন ইঞ্জেকশন দেন, এগুলো ৩০ মিনিট অন্তর অন্তর দেওয়া হয়েছিল, যেহেতু পুড়ে যাওয়ার কারণে তার শরীরের জলীয় পদার্থ কমে যায় তাই তাকে ধমনীর মাধ্যমে রিঙ্গার সলিউশন দেওয়া হয়। একজন তৃতীয় ডাক্তার, ডাঃ ইশি, তাকে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখনো সুভাষ চন্দ্রের পরিপূর্ণ চেতনা ছিল যা এরূপ গুরুতর আহত ব্যক্তির পক্ষে চমকপ্রদ বলে ডঃ ইয়েশিমি মনে করেন। এই চিকিৎসা সত্ত্বেও, শীঘ্রই সুভাষচন্দ্র বসু কোমায় চলে যান। কয়েক ঘন্টা পর, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট শনিবার, রাত নয়টা থেকে

দশটার মধ্যে, ৪৮ বছর বয়স্ক সুভাষচন্দ্র বসু মৃত্যুবরণ করেন। দুদিন পর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট তাইহোকু শ্মশানে সুভাষচন্দ্র বসুর মরদেহ দাহ করা হয়, যদিও তার মৃতদেহ কাউকে দেখানো হয়নি, এমনকি মৃতদেহের কোন ছবিও তোলা হয়নি, জাপানি সংবাদ সংস্থা কর্তৃক মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হয়।

নেতজী যদি জীবিত থাকেন, তাহলে কোথায় গিয়েছিলেন তিনি ? অনেকে বলেন, তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে বন্দি অবস্থায় ছিলেন, কারো কারো দাবি রাশিয়ান সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতার করে এবং সেখানকার কারাগারে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, কেউ বলেন তাঁর মৃত্যু হয় সার্বিয়াতে, বোস : দ্য ইন্ডিয়ান সামুরাই - নেতাজী ও আইএন-এ সামরিক পরিসংখ্যান - বইটিতেও নেতাজীর রাশিয়ায় যাওয়ার উল্লেখ আছে, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জি. ডি. বকশি বইয়ে সাফ বলে দিয়েছিলেন, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, বিষয়টি জাপানের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল যাতে নেতাজি পালিয়ে যেতে পারেন, যখন বসু জাপান থেকে তিনটি রেডিও সিরিয়াল সম্প্রচার করেন, সেইসময়ে ব্রিটিশরা জানত যে বসু জীবিত ছিলেন, ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের কাছে সুভাষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ জানায়, জিজ্ঞাসাবাদের সময় বসুকে এতটাই নির্যাতন করা হয় যে তিনি মারা যান, ১৯৬৬ সালে ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর, শাস্ত্রী উজবেকিস্তানের তাসখন্দে গিয়েছিলেন পাকিস্থানের সাথে তাসখন্দ চুক্তি করার পরই রহস্যজনক ভাবে তার মৃত্যু হয়, অথচ তাঁর চিকিৎসক আর এন চুং দাবি করেন, ভারতের দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রী একদম ফিট ছিলেন। ওই বৈঠকের কিছু ছবিতে এমন এক ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যার চেহারা অবিকল সুভাষচন্দ্রের সাথে মিলে যায়, অনেক ফরেনসিক এক্সপার্টও ব্যক্তিকে সুভাষ বলে দাবি করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যাপারে তৃতীয় মতটি হল ফয়জাবাদের ভগবানজি ওরফে গুমনামি বাবাই হলেন নেতাজী, ১৯৮৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়, চেহারায় কিছুটা মিল আছে বটে, তবে এমন দাবীর পক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নেতাজী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তাঁর মৃত্যু ঘিরে কত না রহস্যের ঘনঘটা, তবুও প্রতিবছর ২৩শে জানুয়ারি তার জন্ম মুহূর্তে শঙ্খধ্বনি করা হয়। এভাবেই সুভাষচন্দ্র আমাদের মনের মনিকোঠায় চির উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে আছেন, শেষ জীবনটি রহস্যাবৃত অবস্থায় কেটে গেছে বলেই বোধহয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তির মহানায়ক।

ভূস্বর্গ

রুবেল সেখ, ১ম সেমিস্টার (বি.এস.সি. জেনারেল)

রাত পড়েছে। সারাদিন ঝর ঝর বৃষ্টি পড়া এখন একটু বিশ্রামের আঙ্গিনায়। সারাপাড়া নিঝুম। নিঃশব্দ হলেও রুমবোদের বাড়ি থেকে এক গুঞ্জন রয়ে গেছে। গুঞ্জনের কারণ হল রুমবো তার মায়ের কাছে গল্প শুনবে। রুমবো এই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। রুমবো প্রায়দিন তার মা'র কাছে গল্প শোনার আবদার করে। মায়ের দুগ্ধ পান করা ছাড়লেও গল্প শোনার রেশ এখনও কাটাতে পারেনি।

— "মা ! একটা গল্প শোনাও না।"এবার রুমবো তীক্ষ্নস্বরে আবদার করে বলল। কোনো উত্তর না পাওয়ায়, সে আবার বলে উঠল।

—"না সোনা! আজ নয়" উত্তর আসল। "আজ কাজ আছে, কাল শোনাই।" পাশের ঘর থেকে উত্তর এল।

অভিমান করে রুমবো ঘরে বসে আছে। এই বয়সে গল্প শোনার আবদার আর অভিমান করাটা অস্বাভাবিক। তবে সে অতন্ত্যমেধাবী ছেলে। তার কথাবার্তা, হাবভাব, চালচলন নিপুন ভাবে যেন গাঁথা। এসবের মাঝে যে এক শৈশবকালের ঐশ্বর্য্য অঙ্কুরিত আছে তা বোঝায় যায় না।

মায়ের ডাক পড়ল, খাওয়ার জন্যে। ছেলে যেন বাড়িতে নেই। তিনি বুঝতে পারলেন যে আদরমাখা ছেলে অভিমান করেছে। এঘরে আসতেই ওনার চোখে পড়ল সে বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছে।

—'বানু ! ভাত খাবে না। রাগ করেছ।' ছেলে মুখভার করে তার কাজকে প্রাধান্য দিয়ে গেল। -"রাগ করা ভালো নয়।" তিনি মুচকি হেসে বললেন। -"ছেলের আবদার না রাখাও ভালো নয়।" ভারমুখে রুমবোর জবাব।

—'আচ্ছা বাবা! তাহলে তোমাকে আজ খাইয়ে দেবো আর গল্প বলবো। তাহলে হবে? একথা শুনে রুমবো আনন্দোচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'হ্যাঁ।' আর মার গালে এক চুম্বন।

গর্ভকালে নাড়ি দ্বারা মা আর সন্তানের মধ্যে সেতু নির্মাণ হয়। তা কাটা পরে। সন্তান যত বড়ই হোক সেই নাড়ির সেতু থেকেই যায়। এমন এক দিন আসবে যেদিন কেউ কাউকে চিনবে না।

রুমবো এখন মায়ের হাতে খাবে আর গল্প শুনবে। রুমবোর মা ভাত মেখে মুখে দিয়ে মজার ছলে বলল, 'আজ বাদে কাল বউ আসবে তখন কী করবি ?"

—"একসাথে।" রুমবো লাজে রাঙা হয়ে খেতে খেতে বলল। "এ বার গল্প বল।"

— "এক রাজ্যে এক ....।''

রুমবো তার মা'র কথা থামিয়ে বলল, "হুম এক রাজ্যে এক রাজা এক রাণী এই তো। অন্য কিছু বলোনা।"

—"এখন এটাই শোনো, এটাও বেশ ভাল। তাহলে থাক।" "ঠিক আছে বলো।"

—"এক রাজ্যে এক রাজা ছিল। তিনি ছিলেন সৎ, সাহসী এবং দয়ালু। তার রাণীও ছিলেন ঠিক তেমনই। আর এমন রাজা পেয়ে প্রজারাও মহা খুশি। তিনি ছিলেন উমার এর মতো। রাজা আর রানীর এক মেয়ে অর্থাৎ রাজকন্যা ছিল। রাজকন্যা অতিসুন্দর ও ভালোমনের অধিকারিণী ছিল। রাজা ভাবছিলেন রাজকন্যার জন্য দেহরক্ষী হিসেবে এক সৎ, সাহসী বীরের দরকার। এই কথা যখন সেনাপতি জানতে পারে তখন সে রাজাকে বলে, আছে একজন বীর সে একাই একশো জনের সমান, সেহলো আমার সন্তান। সে এখন অন্য রাজ্যে গুরুর কাছে শিক্ষা নিচ্ছে।" রাজা তাকে ডাকতে বললেন। সেনাপতির ছেলেকে নিয়ে আসা হল। রাজা তাকে পরখ করে দেখে নিলেন যে কতটা বীর। রাজা তার বীরত্ব দেখে তাকে নিযুক্ত করলেন তার কন্যার দেহরক্ষী হিসেবে। সেদিন থেকে কোথাও রাজকন্যা গেলে, তা

গরীবদের অন্ন-বস্ত্র দান করা, মাজলুমদের পাশে দাঁড়ান, দিনদুখি মানুষকে সাহায্য করা হোক সে থাকত। এমন করেই তারা একে ওপরকে ভালবেসে ফেলে। আর এদিকে শয়তান মন্ত্রী ফন্দী আছে কি করে সিংহাসন দখল করা যায়। সে তার ছেলের সাথে রাজকুমারীর বিয়ে দিয়ে বা তাকে হত্যা করে ছলেবলে কৌশলে তা করবে ভাবে কিন্তু তারা জানতে পারে যে রাজকুমারী সেই সামান্য দেহরক্ষীকে পছন্দ করে।

তাই সিংহাসনের লোভে তার নামে এক মিথ্যা অপবাদ সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেয়। যাতে রাজা সেই রক্ষীটিকে রাজকন্যাটির কাজ বা এরাজ্য থেকে সড়িয়ে দিতে পারে। আর তাদের কুকর্ম সম্পন্ন করতে পারে। অপবাদের কথা জানতে পেরে দেহরক্ষী মন্ত্রীর ছেলের সামনে হাজির হয়। আর কথা কাটাকাটি করতে করতে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। দেহরক্ষী মন্ত্রীর ছেলেকে ঠেলে দেয় আর সে গিয়ে পাশে থাকা ফলাতে পড়ে, আর না চেয়েও তাকে মেরে ফেলে। একটু পর দেহরক্ষীর মা, যিনি রানীর সই সেখানে উপস্থিত হয়। মন্ত্রী রাজাকে জানায়, তাকে গ্রেফতার করা হয় আর বিচারের দিন ঠিক হয়। বিচারের দিন রাজা দেহরক্ষীকে জিজ্ঞেস করল, "কেন তাকে হত্যা করলে।" দেহরক্ষী বলল, "সে রাজকুমারীর নামে কুকথা ছড়িয়েছে আর আমি তাকে হত্যা করতে চাইনি ধস্তাধস্তিতে কখন হয়েগেল।" রাজা বলল, "শুনতে পাচ্ছি যে তুমি নাকি রাজকুমারীকে ভালবাস তাই হত্যা করেছে।"

দেহরক্ষী বীরের মতো বলল, "হ্যাঁ। আমরা একে ওপরকে ভালবাসি।" রাজা একথা শুনে রাজা বলল, "এতো সাহস, তুমি আমার সামনে এমন কথা বলছ। রাজা রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করল, সে কি তাকে পছন্দ বা ভালোবাসে কী। সভাসদের সামনে ভয়ে ভয়ে রাজকুমারী জানাল, না। রাজা রেগে দেহরক্ষীকে বলল, তাহলে হত্যা কেন করলে। তাহলে আমাকে বলনি কেন। সে আমার মেয়ে হলেও সে আমার প্রজা। রাজা আমি, বিচার করব আমি।" বিচারে সেনাপতির ছেলে দোষী হয়। বিচারে মন্ত্রীর কথায় রাজা দেহরক্ষীকে মন্ত্রীর ছেলেকে হত্যা করার অপরাধে কারাগারে বন্দী করার হুকুম দেওয়া হয়। এ কথা শুনে দেহরক্ষীটির মা কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বলল, আমি হত্যা করেছি। আমি হত্যা করেছি। আমাকে সাজা দিন। প্রহরীরা তো দেখেছে আমি ওখানে ছিলাম। তার কান্না তার কাকুতি মিনতি কিছুই কাজে আসল না। ছেলের জন্য মায়ের চোখের জল কখনও বৃথা যায় না কিন্তু আজ তাই ঘটল। এই বলে বুমবোর মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—"রাজকুমারী কেন মিথ্যা বলল? সত্য কথা বললে তো দেহরক্ষীর সাজা কম হতো।' "হয়ত কম হতো।"

—"তাহলে কি সে তাকে ভালবাসত না? তাকে কি তাহলে সে ঠকাল? বলো মা, বলো মা।'

রুমবোর খাওয়া শেষ তার মা তার মুখ মুছতে মুছতে ছেলের এমন কৌতূহলে মায়ের সন্দেহ সূচক উত্তর 'হয়ত।'

—"হয়ত মানে?"

—"আমি কি বলেছি গল্প শেষ। গল্প তো অর্ধেক হল। শেষ হলে তবে তো বলা যাবে কে কি।"

—"বাকি টুকু বল মা।' 'না। কাল বলবো।'

—"না। এখনি বলো।" সে আরও গুরুত্ব দিয়ে বলল।

—"সোনা আমার! কালকে বলবো। এখন ঘরে যাও"।

রুমবো, চঞ্চল কৌতূহলপূর্ণ ছেলেটি আর কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল।

স্মরণীয় বরণীয়

ডঃ শুভদীপ দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)

অতিমারীর রেশ টেনে ২০২২ সালও আমাদের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে এমন কিছু কৃতী মানুষকে যাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে আমাদের মননে দর্শনে যাপনে থেকে যাবেন চিরজীবী হয়ে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলার শিল্প সংস্কৃতি ক্রীড়া জগতের তেমনই কিছু স্বনামধন্য মানুষের কথা রইল যা আগামীতে আমাদের পাথেয় হয়ে উঠবে —

প্রশান্ত ভট্টাচার্য (১৯৩৯ — ৮ জানুয়ারি, ২০২২) - প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। গত শতকের সাতের দশকের উত্তাল সময় পর্বে গণসঙ্গীত ও গানের মাধ্যমে পথ চলা শুরু। একদিকে নকশাল আন্দোলন, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ— গানকে সঙ্গী করেই লড়াইয়ে নেমেছিলেন তিনি। নাট্য, যাত্রা-জগতে তো বটেই, ছিলেন ইন্ডিয়ান রেডিও-র নিয়মিত শিল্পী। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে লোকগান, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর। তবে শেষ জীবনে লোকচক্ষুর আড়ালেই বিদায় নিলেন কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী।

শাঁওলি মিত্র (১৯৪৮ — ১৬ জানুয়ারি, ২০২২) - প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব। বাবা শম্ভু মিত্রের সার্থক উত্তরসূরী। প্রাথমিক ভাবে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, পরবর্তীতে নিজস্ব নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। বাংলা থিয়েটার প্রেমীদের উপহার দেন "পাগলা ঘোড়া", "কথা অমৃতসমান", "নাথবতী অনাথবৎ"-এর মতো নাটক। শাঁওলির প্রয়াণে ইতি পড়েছে রঙ্গমঞ্চের এক বর্ণময় অধ্যায়ে।

মিহির সেনগুপ্ত (১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ — ১৭ জানুয়ারি ২০২২) - প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। দেশভাগের স্মৃতিকথার এক সত্যনিষ্ঠ কথাকার। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল সদাজাগ্রত। তাঁর আখ্যান যেন গ্রামীণ ইতিহাসের দলিল। উল্লেখযোগ্য বই "বিষাদবৃক্ষ", "সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম", "ভাটি পুত্রের বরিশালী গদ্যসংগ্রহ", "টিলা অরণ্যের পাকদণ্ডী", "ধানসিদ্ধির পরণকথা" ইত্যাদি।

নারায়ণ দেবনাথ (১৯২৫ — ১৮ জানুয়ারি, ২০২২) — প্রবাদ প্রতিম শিল্পী, যাঁর হাত ধরেই গড়ে উঠেছে আপামর বাঙালির শৈশব। বাংলা সাহিত্যে কমিকসকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে রয়েছেন তিনিই। হাঁদাভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট থেকে শুরু করে নন্টে ফন্টে— তাঁকে ছাড়া অসম্পূর্ণ বাংলা কমিকসের ইতিবৃত্ত। মৃত্যুকালে কিংবদন্তি কমিক-স্রষ্টার বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর।

সুভাষ ভৌমিক (০২ অক্টোবর ১৯৫০—২২ জানুয়ারি, ২০২২) - কলকাতা ময়দানের "অলরাউন্ড ফরোয়ার্ড" তিনি। তাঁর ক্ষিপ্র গতি, শারীরিক ভারসাম্য এবং সুযোগসন্ধানী মানসিকতা কাঁপ ধরাত বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের বুকে। কলকাতা লিগ, আই এফ এ শিল্ড, ডুরান্ড কাপ, রোভার্স কাপ, ফেডারেশন কাপ সহ একাধিক ট্রফি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। শুধু খেলোয়াড় হিসাবেই নয়, ইস্টবেঙ্গলকে আশিয়ান কাপ এনে দিয়ে কোচিং-এর জগতেও গড়েছেন অনন্য নজির।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত (৩০ আগস্ট ১৯৫১— ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২) মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান কলকাতার তিন বড়ো ক্লাবেই খেলেছেন সুরজিৎ। সন্তোষ ট্রফিতে করেছেন বাংলার অধিনায়কত্বও। ২০২২-এর শুরুতেই কোভিডে আক্রান্ত হন কিংবদন্তি ফুটবলার। চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে প্রয়াত হন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (০৪ অক্টোবর ১৯৩১—১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)— বাংলা সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তী শিল্পী। বাংলা সিনেমার গান ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও পুরস্কার ফিরিয়ে দেন তিনি। ঠিক তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি করা হলে,

ধরা পড়ে করোনায় আক্রান্ত তিনি। কোভিডের কারণেই মৃত্যু হয় গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের।

বাপ্পি লাহিড়ী (২৭ নভেম্বর ১৯৫২—১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)— বলিউডের বিখ্যাত বাঙালি সুরকার, প্রকৃত নাম অলোকেশ লাহিড়ী। গত শতকের আট ও নয়ের দশকের একাধিক সুপারহিট গানের স্রষ্টা। ২০২২-এর শুরুতে করোনাকে হার মানিয়ে বাড়িতে ফিরলেও, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বাই-এর হাসপাতালে মৃত্যু হয় এই জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীর।

মৃণাল বসুচৌধুরী (১৩ জানুয়ারি ১৯৪৪—২ মার্চ, ২০২২) - প্রথাবিরোধী কবি ছয়ের দশকে সাড়াজাগানো "শ্রুতি" আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। প্রথম কবিতার বই "মগ্নবেলাভূমি" (১৯৬৫)। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ "শহর কলকাতা" (১৯৭০), "গুহাচিত্র" (১৯৭৬), "শব্দনির্মাণ" (২০০১), "স্বর্গ থেকে নীলপাখি" (২০০৪) ইত্যাদি। গতানুগতিক সাহিত্যচর্চার ছক ভেঙে কবিতার জগতে নতুন ধারা নিয়ে এসেছিলেন মৃণাল বসু চৌধুরী।

পার্থ ঘোষ (৩১ ডিসেম্বর ১৯৪০—৭ মে, ২০২২) - প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী। পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ দম্পতির উপস্থাপনায় "কর্ণ-কুন্তীসংবাদ" আজও আবৃত্তিপ্রেমীদের স্মৃতিতে অমলিন। রেডিয়োয় উপস্থাপক হিসেবে আবৃত্তিকার দম্পতি পার্থ-গৌরীর পেশাজীবন শুরু। দীর্ঘদিন তাঁরা আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "শেষবসন্ত" পার্থের কণ্ঠে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। একই সঙ্গে জনপ্রিয় হয় রবীন্দ্রনাথেরই "দেবতার গ্রাস", "বিদায়।" এ ছাড়া গৌরীর সঙ্গে বেশ কিছু শ্রুতিনাটক "প্রেম", "জীবনবৃত্ত", "স্বর্গ থেকে নীলপাখি" স্মরণে রাখার মতো।

আব্দুল গফফার চৌধুরী (১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪—১৯ মে, ২০২২) - প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক। ভাষা দিবসের স্মৃতিতে কালজয়ী গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি..." গানের স্রষ্টা তিনিই। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সাক্ষী তিনি। দীর্ঘকাল ইংল্যান্ড প্রবাসী। স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লেখালিখি করেছেন একাধিক পত্র-পত্রিকায়। বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৮ বয়সে প্রয়াত হন কিংবদন্তি বাঙালি ব্যক্তিত্ব।

তরুণ মজুমদার (৮ জানুয়ারি, ১৯৩১ - ৪ জুলাই, ২০২২) - প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। "চাওয়া পাওয়া" সিনেমার মাধ্যমে অভিষেক হয়েছিল চলচ্চিত্র পরিচালনায়। সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল এই কিংবদন্তি-ত্রয়ীর বাইরে বাংলা চলচ্চিত্রের ভিন্ন এক ন্যারেটিভ তৈরি করেছিলেন তরুণ মজুমদার। চলচ্চিত্র প্রেমীদের উপহার দিয়েছিলেন "শ্রীমান পৃথ্বীরাজ", "গণদেবতা", "বালিকাবধূ", "দাদার কীর্তি" "আলো"র মতো ছবি।

নির্মলা মিশ্র (২১ অক্টোবর ১৯৩৮—৩১ জুলাই, ২০২২) - প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী। বাংলা গানের স্বর্ণযুগে বাঙালি শ্রোতাদের আলাদা স্বাদ এনে দিয়েছিলেন তিনি। "এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না", "তোমার আকাশ দুটি চোখে" কিংবা "ও তোতা পাখিরে"-বাংলাকে তিনি উপহার দিয়েছেন একের পর এক সুপারহিট গান। ওড়িয়া চলচ্চিত্রের জগতেও ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত মুখ। বার্ধক্যজনিত অসুখে দীর্ঘদিন ভোগার পর হৃদরোগে মৃত্যু হয় কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পীর।

সমর (বদ্রু) বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০ জানুয়ারি ১৯৩০—২০ অগাস্ট ২০২২) কিংবদন্তী ফুটবলার। ১৯৫৬-তে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন বদ্রু ব্যানার্জি। ১৯৫২-৫৯, মোট সাত বছর মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন বদ্রু ব্যানার্জি। ১৯৫৮ সালে মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালে ফুটবলার হিসেবে এবং ১৯৬১ সালে বাংলার। কোচ হিসাবে জেতেন সন্তোষ ট্রফি।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা (পড়ুয়া সপ্তাহ উদ্‌যাপন ২০২৩)

তিথি ঘোষ (প্রথম)

দিশা গুঁই (দ্বিতীয়)

রাকেশ ধর (তৃতীয়)

পোস্টার প্রতিযোগিতা (পড়ুয়া সপ্তাহ উদ্‌যাপন ২০২৩)

রাকেশ ধর (প্রথম)

পৃথ্বী মণ্ডল (দ্বিতীয়)

পার্থ শর্মা (তৃতীয়)

ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আঁকা ছবি

বৃষ্টি মণ্ডল (৫ম সেমিস্টার)

পূজা পাল (৫ম সেমিস্টার)

দিশা গুঁই (১ম সেমিস্টার)

পৃথ্বী মণ্ডল (১ম সেমিস্টার)

মৌসুমী মণ্ডল (৫ম সেমিস্টার)

পৃথ্বী মণ্ডল (১ম সেমিস্টার)

সুমনা হালদার (১ম বর্ষ) সাধারণ বিভাগ

পৃথি মণ্ডল, (১ম বর্ষ) ইতিহাস অনার্স

অঙ্কন বিশ্বাস, (১ম বর্ষ), ইরেজী অনার্স

বিদিসা ঘোষ (৫ম সেমিস্টার) ইংরিজী অনার্স

তিথি ঘোষ (১ম সেমিস্টার) দর্শন অনার্স

সুমনা হালদার (১ম সেমিস্টার) সাধারণ বিভাগ

দেবার্ষণ মণ্ডল (৩য় সেমিস্টার) সাধারণ বিভাগ

পার্থ শর্মা (১ম সেমিস্টার) ইতিহাস অনার্স

রঙ্গোলী অঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০২৩

রাকেশ ধর, (৫ম সেমিস্টার) ইতিহাস অনার্স

পার্থ শর্মা (১ম সেমিস্টার) ইতিহাস অনার্স

রাকেশ ধর (৫ম সেমিস্টার) ইতিহাস অনার্স

দিলীপ কুমার রায় (১৯১৭ — ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২) প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষক। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের নাতি। শুধু কান্তকবির গানের সুর-সংরক্ষণই নয়, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলা গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তিনি। তাঁর কাছে গানের পাঠ নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, অর্ঘ্য সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। অতুলপ্রসাদী ও কান্তগীতিকে নতুন করে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তিনিই। তৈরি করেছিলেন কান্তগীতির স্বরলিপি।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১০ ডিসেম্বর ১৯৪৭ - ২ অক্টোবর ২০২২)- শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক। বাংলায় চার্বাক ও মার্ক্সীয় দর্শনে মৌলিক চিন্তাভাবনার পথ প্রদর্শক। চার্বাক ও লোকায়ত দর্শনকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। একাধিক মননশীল বিষয়ে সবমিলিয়ে ২৭টি গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। উল্লেখযোগ্য বই "মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা", "বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা", "দ্বন্দ্বতত্ত্ব জিজ্ঞাসা", "মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব", "পরশুরাম গল্পকার", "পরশুরাম বিবিধ", "কামারের এক ঘা", "ক্লাসিক কেন চিরায়ত", "ওরে বর্ণচোরা ঠাকুর এল ইত্যাদি বিতর্ক", "রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী" ইত্যাদি। ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয় এই যুক্তিবাদী বাঙালি মনীষার।

মায়া ঘোষ (১৯৩৩ — ৩ ডিসেম্বর, ২০২২) - প্রখ্যাত নাট্যকর্মী। বাংলা থিয়েটারের নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শরিক। উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠিত "পিপলস লিটল থিয়েটার"- এর সদস্য হিসাবে তাঁর প্রথম মঞ্চে হাতে খড়ি হয়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকার গঠনের পর দলের অন্যতম গুরুত্ব পূর্ণ সদস্য হয়ে ওঠেন মায়া। "রাজরক্ত", "চাকভাঙা মধু" কিংবা "সাঁওতাল বিদ্রোহ"-এর মতো নাটকে তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয়।

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (৭ জুন ১৯৪০ - ১৯ ডিসেম্বর ২০২২) - আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার অন্যতম প্রাণপুরুষ। বিগত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস খুঁড়ে বার করেছিলেন তিনি। ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর তথ্যসংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ধমান, নদিয়া-নবদ্বীপ, টেরাকোটা এবং চৈতন্যদেবের ওপর একাধিক আন্তর্জাতিক মানের কাজ রয়েছে তাঁর। উল্লেখযোগ্য বই "বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি", "বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি", "যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য" ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : প্রহর ডট ইন, আনন্দবাজার পত্রিকা

মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক চালচিত্র

২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৫ সাল থেকে তেহট্ট মহাবিদ্যালযে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম বছরে সমাজ বিজ্ঞান শাখার বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই পাঁচটি বিষয়ের উপর অনার্স কোর্স এবং সমাজ বিজ্ঞানের জেনারেল কোর্স চালু হয়। গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এই তিন বিষয়কে নিয়ে বিজ্ঞানের একটি জেনারেল কোর্স শুরু করা হয় ঠিক পরের বছর (২০১৬ সাল) থেকে।

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা শিখন ও শিক্ষণের প্রথাগত পদ্ধতির সঙ্গে নানাবিধ উদ্ভাবনী পদ্ধতির মিশেল ঘটিয়ে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করতে সচেষ্ট থাকেন। এছাড়া নিজেদের ধারাবাহিক উৎকর্ষ বিধানের জন্য অধ্যাপক অধ্যাপিকারা বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, আলোচনাচক্র ও ডিজিট্যাল মাধ্যমে (যেমন ওয়েবিনার) নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিভিন্নধরনের জার্নালে গবেষণামূলক ও সৃজনশীল প্রবন্ধ লেখা এবং গ্রন্থ প্রকাশও করে থাকেন।

মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস করার পাশাপাশি লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়াশোনা এবং ক্লাস টেস্টে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে শিখন পদ্ধতিকে অব্যাহত রেখে নিজেদের সমৃদ্ধ করে চলেছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে তাত্ত্বিক বিষয়গুলি পূর্ণতর ধারণা অর্জনে সচেষ্ট থাকে। এর পাশাপাশি কলেজের পত্রিকায় সৃজনাত্মক রচনা, চিত্রাঙ্কন, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং নানাবিধ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া কলেজের 'জাতীয় সেবা প্রকল্প'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে বৃহত্তর সমাজের সেবায় নিয়োজিত করে নিজেদের।

এই কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়বার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিগত পাঁচ বছরে এম.এ. পাঠরত এবং উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় ৭৫ জন (বাংলা-২১, ইংরাজি-০৩, ইতিহাস-২৭, দর্শন-১১ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১১ জন)। এদের মধ্য থেকে এখনো পর্যন্ত ৫ জন (বাংলা-২, ইতিহাস-১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১ ও দর্শন-১) সেট (SET) ও নেট (NET) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে ১৫ জন প্রাক্তন ছাত্র (বাংলা-৮, ইরেজি-১, ইতিহাস-৩, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১, দর্শন-১, বিজ্ঞান-১) ইন্ডিয়ান আর্মি, সি.আর.পি.এফ. ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং বি.এস.এফ এর চাকরিতে যোগ দিয়েছে।

উৎকর্ষতা বজায় রেখে তেহট্ট ও সন্নিহিত এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মহাবিদ্যালয়ের সামগ্রিক বিস্তারের কিছু পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞান জেনারেল কোর্সের পরীক্ষাগার গুলিকে ধাপে ধাপে অনার্স কোর্সের উপযোগী করে তোলা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান শাখার তিনটি বিষয় গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের উপর অনার্স কোর্স চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ছাড়পত্র আদায় করার সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণটি পর্যাপ্ত সবুজ ও পরিবেশ বান্ধব। এছাড়া কলেজের সামগ্রিক সামাজিক পরিমণ্ডলটি যাতে সুস্থ ও সুন্দর থাকে সেই লক্ষ্যে ধর্ম ও বর্ণগত অন্তর্ভুক্তি, লিঙ্গসাম্য, গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়-দায়িত্ব, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মহাবিদ্যালয়ের সর্বস্তরের অংশীদারের (ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, অশিক্ষক শিক্ষাকর্মী) নিয়ে নানা সময়ে নানা ধরনের কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। একমাত্রিক পঠনপাঠনে নিমজ্জিত হয়ে কেরিয়ার সর্বস্বতার পাঁকে ডুবে না গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পূর্ণ সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠায় যদি কিছুমাত্র অবদান থাকে তাতেই মহাবিদ্যালয়ের প্রকৃত সার্থকতা।

TEACHING STAFF

FACULTY OF ARTS

DEPARTMENT OF BENGALI :

1. Dr. Sibsankar Pal (M.A, B.Ed., Ph.D.) Associate Professor & Officer-in-Charge
2. Dr. Nitish Ghosh (M.A, B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
3. Dr. Shubhadip Debnath (M.A, M. Phil., Ph. D.) Assistant Professor

DEPARTMENT OF ENGLISH :

1. Saidul Haque (M.A, M. Phil., Ph.D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF HISTORY :

1. Raghunath Roy (M.A, B.Ed.) Assistant Professor & Head of the Department
2. Gopal Mandal (M.A, B.Ed.), Assistant Professor
3. Pallabi Chatterjee (M.A, Ph.D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY :

1. Dr. Liza Dutta (M.A, M. Phil., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Md. Najir Hossain (M.A, B.Ed.), Assistant Professor
3. Priya Tudu (M.A, M. Phil., B.Ed.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE :

1. Pritin Dutta (M.A, Ph.D pursuing), Assistant Professor & Head of the Department
2. Avijit Saha (M.A, M. Phil., B.Ed., PhD pursuing), Assistant Professor

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF PHYSICS

1. Dr. Swarup Ranjan Sahoo (M.Sc., Ph.D.), Associate Professor & Head of the Department
2. Dr. Jyotirmoy Maiti (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Ajoy Mandal (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
4. Dr. Sumit Kumar Das (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor

DEPARTMENT OF CHEMISTRY :

1. Dr. SK Basiruddin (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Sanjoy Satpati (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Ramij Raja Mondal (M.Sc., Ph.D.), Assistant Professor
4. Susmita Chowdhury (M.Sc., Ph. D. pursuing), Assistant Professor

DEPARTMENT OF MATHEMATICS :

1. Dr. Supratim Mukherjee (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor & Head of the Department
2. Dr. Haridas Biswas (M.Sc., B.Ed., Ph.D.), Assistant Professor
3. Dr. Md. Abul Kashim Molla (M.Sc., B.Ed., Ph. D.), Assistant Professor

LIBRARIAN

Gouranga Mondal

(M.Sc., M.Lib. & I.Sc.)

NON-TEACHING STAFF

OFFICE STAFF :

1. Tridip Sinha (UDC)
2. Sk Nasir (Group-D)
3. Maitra Sarder (Group-D)
4. Subrata Halder (DEO)
5. Debabrata Mondal (DEO)
6. Puspita Saha (DEO)

SECURITY GUARD :

1. Krishna Kanti Halder
2. Sankar Kumar Biswas
3. Sadhan Bairagya
4. Sarthak Dutta

KARMABANDHU :

1. Arpita Halder
2. Nepal Halder

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

২৩শে জানুয়ারী উদ্‌যাপন

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

৭ম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ২০২৩

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ''জ্যাভলিন থ্রো''

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ''লং জাম্ফ''

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ২০২২

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩

সংবিধান সপ্তাহ পালন ২০২২

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন ২০২২

সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন ২০২২

স্টুডেন্টস্ হেল্‌থ হোম ২০২৩

বার্ষিক পত্রিকা
ধনধান্য
শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২০২৩

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শিবশংকর পাল কর্তৃক মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ আর্ট প্রেস, রানাঘাট, নদিয়া ● মুঠোফোন ঃ ৯০৬৪৭৫৭২২১